গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ৮ - ১৪ জুলাই, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

দুর্নীতির পক্ষেই সাফাই গাইলেন প্রধানমন্ত্রী

সরকারি সম্পত্তি লুটের একের পর এক ঘটনা জেনে দেশের মানুষ খুবই উদ্বিগ্ন। জনগণ জানতে ব্যগ্র যে, জনসাধারণের টাকার এমন ব্যাপক লুট বন্ধে এবং এর সাথে যুক্ত রাজনীতিক, আমলা ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সরকার কী কী ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। ঠিক এই সময়ে এ বিষয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যা বললেন, তাতে পরিষ্কার যে, দোষীদের শাস্তি দিয়ে ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার দ্বারা এই চূড়ান্ত দুর্নীতি বা লুট বন্ধে কংগ্রেস সরকারের কোনও সদিচ্ছাই নেই। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী এইসব ফাঁস হওয়া দুর্নীতির ঘটনার পক্ষে যেভাবে সাফাই দিয়েছেন ও এভাবে দুর্নীতির ঘটনা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য 'ক্যাগ' ও সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তা-ও বিস্ময়কর।

২৯ জুন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং দেশের গুটিকয়েক পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে মত বিনিময়ের জন্য একটি বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন, ক্যাগ রিপোর্ট যেসব অনিয়ম এবং ঘুষ ও বেআইনি লেনদেনের দৃষ্টান্ত প্রকাশ করেছে, সেসব ক্ষেত্রে সব সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল একটা 'সরল বিশ্বাসে' ও এমন একটা পরিবেশ-পরিস্থিতিতে, যখন নিশ্চিত ভাবে সরকারের কিছু জানা ছিল না। কংগ্রেসের ইউ পি এ সরকার সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ এবং মনমোহন সিং একজন নিষ্ক্রিয় ও প্রতিবন্ধী প্রধানমন্ত্রী মাত্র — এই অভিযোগের জবাব দিতেই যেন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সরকারের নেওয়া দশটা সিদ্ধান্তের মধ্যে সাতটা ঠিক আর তিনটে ভুল হলে, তাকে উজ্জ্বল সাফল্যই তো বলা উচিত'। আপাত অর্থে যুক্তিটা ঠিক মনে হলেও যে তিনটে সিদ্ধান্ত ভুল বলে ধরা পড়ছে, সেটা কি যথার্থই ভুল, অপদার্থতা, নাকি ইচ্ছাকৃত ভাবেই সেটা ঘটেছে, তার বিচার হওয়া দরকার। অভিযুক্ত যেখানে স্বয়ং দেশের সরকার এবং অভিযোগ যেখানে গুরুতর, সেখানে শুধু ভুল বলে পার পাওয়া যায় কি?

প্রথমত, টু জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারির প্রশ্নই যদি ধরা যায়, তাহলে প্রধানমন্ত্রী বা সরকার এ বিষয়ে কিছুই জানতে-বুঝতে পারেননি, এটা নিতান্তই ছেলেভোলানো অজুহাত। টু জি লাইসেন্স দেওয়ার জন্য নিলাম ডাকার সিদ্ধান্তই ছিল সন্দেহজনক। এবং টেলিকম মন্ত্রী এ রাজার নিলাম ডাকার সিদ্ধান্তে প্রধানমন্ত্রী আপত্তিও জানিয়েছিলেন। কিন্তু ওটুকুই। তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও মন্ত্রী এ রাজা যখন তার পরিকল্পনা মতো এগিয়ে গেলেন, মনমোহন সিং বাধা দেননি কেন? তাঁর মতো অর্থনীতির পণ্ডিতের এটা তো জানা কথা যে, বাজারদরের চেয়ে কম দামে সরকারি লাইসেন্স বিক্রি করে মন্ত্রী জেনেবুঝে ঐ লাইসেন্স বেশি দামে হাত বদলের ও সেই সুবাদে নিজের জন্য কাটমানির ব্যবস্থা করে নিচ্ছিলেন। এবং এর পিছনে দেশের বড় বড় টেলিকম ব্যবসায়ীরা যুক্ত আছে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর তো দায়িত্ব দিল তখনই দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া। তিনি

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিধান পরিষদ গঠিত হলে তা হবে একটি ঐতিহাসিক ভুল

বিধানসভায় অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর

২৮ জুন বিধানসভায় বিধান পরিষদ সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর বিতর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বিধায়ক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বলেন,

এই প্রস্তাবের উপর বিতর্কে অনেকে নানা বিষয় তুলেছেন। আমার জন্য বরাদ্দ সময় খুব কম। আমার মনে হয়েছে, বিধান পরিষদ থাকলে সিঙ্গুর বিল এত দ্রুত আইনে পরিণত করা যেত কি না সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, পরিষদ একটি বিলকে ৪ মাস পর্যন্ত বিলম্ব করিয়ে দিতে পারে। অথচ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সিঙ্গুর বিল এনে তাকে আইনে পরিণত করার জন্য আমরা এই সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম।

হাউস অব লর্ডস ও হাউস অব কমনসের প্রসঙ্গ এখানে বিতর্কে এসেছে। রেনেশাঁস আন্দোলন ও শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব পার্লামেন্টে সুনিশ্চিত হওয়ায় সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের আভিজাত্যে আঘাত লাগে। এই অভিজাতদের খুশি করার জন্য তাঁদের মধ্য থেকে মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় হাউস অব লর্ডস, যাকে চাপিয়ে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গঠিত হাউস অব কমনসের উপর। এই ইতিহাস এখানে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিলের কথা যিনি অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত কোনও আইনসভাকে সমর্থন করেননি। তিনি বলেছিলেন "...দি মেইন রিলায়েন্স ফর টেম্পারিং দি অ্যাসেনডেন্সি অব দ্য মেজরিটি ক্যান নট বি প্লেসড ইন এ সেকেন্ড চেম্বার অব এনি কাইন্ড। দ্য ক্যারাক্টার অব এ রিপ্রেজেনটেটিভ গভর্নমেন্ট ইজ ফিক্সড বাই দ্য কনস্টিটিউশন অব দ্য পপুলার হাউস। কমপেয়ারড উইথ দিস, অল আদার কোয়েশ্চেনস রিলেটিং টু দ্য ফর্ম অব গভর্নমেন্ট আর ইনসিগনিফিক্যান্ট।" প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড ল্যাস্কির মধ্যেও একই সুর পাওয়া যায়।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৬৯ সালে এই হাউসে প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা প্রয়াত অজয় মুখার্জী ও সদ্য প্রয়াত সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভূমিকার কথা। সর্বসম্মতভাবে তখন বিধান পরিষদ বাতিল হয়েছিল। আমি মনে করি, ১৯৬৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ঐ সিদ্ধান্ত যদি একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হয় তাহলে আজ এই প্রস্তাব গৃহীত হলে তা হবে একটি ঐতিহাসিক ভুল।

সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে। আমি জানি দীর্ঘ পরিবর্তনের আন্দোলনে সমাজের বিভিন্ন অংশের বিদ্বজ্জনেরা কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁদের কাউন্সিলে মনোনীত করার প্রয়োজনীয়তা বোধগম্য হচ্ছে না। রাজ্য সরকার বন্দী মুক্তি রিভিউ কমিটি বা উচ্চশিক্ষার উপদেষ্টা কমিটি ইত্যাদি গঠন করেছে — যাকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। এমন উপদেষ্টা কমিটি তো করা সম্ভব।

এই বিধানপরিষদ গঠন হলে কী বিপুল ব্যয় বৃদ্ধি হবে তা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। অপ্রয়োজনে এত ব্যয় সরকার বৃদ্ধি করবে কেন? মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সরকারি ভাঁড়ার শূন্যের কথা বারবার বলেছেন এবং যার জন্য বিগত সরকারের ভ্রান্ত নীতিকেই দায়ী করেছেন। ভোট অন অ্যাকাউন্টে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই রাজ্যকে ঋণজর্জরিত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিধানসভার বেতন নেবেন না বলেছেন। রাইটার্সের নিজের রুম সংস্কারের জন্য তাঁর লোকসভার সদস্য হিসাবে বেতনের জমানো টাকা থেকে মুখ্য সচিবকে দান করেছেন — এসব নতুন সদস্যদের কাছে অনুকরণীয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয়েছে এই বিল মুখ্যমন্ত্রীর উপরোক্ত পদক্ষেপগুলির সঙ্গে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমার দল ইতিমধ্যেই এই বিল প্রত্যাহারের দাবি করেছে। আমি সরকারকে এই বিল পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি।

এতগুলি শিশুর মৃত্যু দেখিয়ে দিল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দৈন্য দশা

কলকাতার বি সি রায় শিশু হাসপাতালে ৩৬ ঘণ্টায় ১৮টি শিশুর মৃত্যু রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দৈন্য দশা নগ্ন করে দিল। এই হাসপাতালে ২০০২ সালে ৩ দিনে ১৮টি শিশু মারা গিয়েছিল। ২০০৬ সালে ৭২ ঘণ্টায় মারা গিয়েছিল ২২টি শিশু। সেই সময় চিকিৎসার অব্যবস্থা এবং গাফিলতি নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন শাসকবর্গ এর প্রতিকারে যে যথাযথ নজর দেয়নি, একসঙ্গে এতগুলি শিশুর অকালমৃত্যু তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

এই হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ৫-৬টি করে শিশু মারা যায়। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, ভর্তি হওয়া শিশুর ১৫ থেকে ২০ শতাংশের মৃত্যু এখানে স্বাভাবিক মৃত্যুহার। কিন্তু এতগুলি শিশুই বা মারা যাবে কেন? ৩৬০ শয্যার এই হাসপাতালে ভেন্টিলেটর মাত্র ৮টি, সিটি স্ক্যান একটিও নেই। এটি রাজ্যের একমাত্র রেফারাল হাসপাতাল। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালে পরিকাঠামো গড়ে তোলায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না কেন? এই অব্যবস্থা আর কতদিন চলবে? কেনই বা জেলায় জেলায় শিশু হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে না? চালু হাসপাতালগুলিতে শিশুবিভাগকে কেন চিকিৎসার উপযুক্ত মানে উন্নীত করা হচ্ছে না? কেন ৩০০ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে একজন শিশুকে ভর্তি হতে হবে এখানে? নতুন সরকারকে অনতিবিলম্বে শিশুমৃত্যু ঠেকানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সহ জনগণের দীর্ঘকালের অবহেলিত ন্যায়সঙ্গত দাবি, সরকারি হাসপাতালে উপযুক্ত আধুনিক চিকিৎসা দেওয়ার সমস্ত রকম পরিকাঠামো দ্রুত গড়ে তুলতে হবে। এই শিশুমৃত্যু সমাজের আর একটি গভীর ক্ষত স্পষ্ট করে দেখিয়ে গেল। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মায়েদের পুষ্টির অভাব এবং রক্তাল্পতা শিশুর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা উপযুক্ত মানে না থাকার অন্যতম কারণ। কেন মায়েরা অপুষ্টির শিকার? এর কারণ যে ভয়াবহ দারিদ্র এবং তীব্র

তিনের পাতায় দেখুন

ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবি

২৯ জুন গোসাবা বিডিও অফিসে আয়লা দুর্গতদের বিক্ষোভ । সংবাদ দুয়ের পাতায়।

মন্ত্রীদের আশ্বাস সত্ত্বেও ভর্তি সমস্যা তীব্র
চাপড়ায় ডিএসও-র আন্দোলন

নেতা-মন্ত্রী এবং শিক্ষা জগতের কর্তা ব্যক্তিদের হাজারো আশ্বাস সত্ত্বেও রাজ্যের কলেজে কলেজে যে প্রবল ভর্তি সমস্যা চলছে তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ নদীয়ার চাপড়া বাঙ্গালজি মহাবিদ্যালয়। সেখানে প্রায় চোদ্দশো ছাত্রছাত্রী ফর্ম তুললেও ভর্তি হতে পেরেছে মাত্র পাঁচশ জন। ফলে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী হন্যে হয়ে প্রতিদিন এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে ঘুরছে। সমস্ত উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর ভর্তির দাবিতে এ আই ডি এস ও চাপড়া কলেজ কমিটির পক্ষ থেকে ৩০ জুন চাপড়া বি ডি ও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কলেজ থেকে বিডিও অফিস পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করে। এ আই ডি এস ও নদীয়া জেলা সম্পাদক কমরেড কামালউদ্দিন, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মোজাম্মেল হোসেন এবং জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ইমতিয়াজ খানের নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বিডিও-র সঙ্গে দেখা করে সকল ছাত্রছাত্রীর ভর্তির দাবি জানালে বিডিও সকলকে ভর্তি করার আশ্বাস দেন।

শিশুমৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানাল হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি

৩৬ ঘণ্টায় ডাঃ বি সি রায় শিশু হাসপাতালে ১৮ জন শিশুর মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ১ জুলাই অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপি দেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য ডাঃ সজল বিশ্বাস সহ ২২ জন সদস্য। কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে ইতিপূর্বেও ঐ হাসপাতালে একাধিকবার একই ধরনের শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ভবিষ্যতে এই অনভিপ্রেত ঘটনা যাতে না ঘটে সে জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নজর দেওয়ার জন্য স্মারকলিপিতে দাবি জানানো হয় — ১) জরুরি বিভাগের বেড ও অন্যান্য পরিকাঠামো বাড়াতে হবে — যাতে কোনও বেডে একাধিক রোগীকে ভর্তি হতে না হয়। ২) নবজাতক বিভাগের বেড ও পরিকাঠামো বাড়াতে হবে — যাতে কোনও নবজাতককে সাধারণ বিভাগে ভর্তি হতে না হয়। ৩) পি সি ইউ এবং এন আই টি ইউ সহ হাসপাতালের সমস্ত পরিষেবা বিনামূল্যে দিতে হবে। ৪) ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর সমস্ত শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে। ৫) ডাক্তার সহ সমস্ত স্টাফদের আরও মানবিক হতে হবে। রোগীর আত্মীয়রা যাতে সময়মতো রোগী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ৬) এই অনভিপ্রেত শিশুমৃত্যুর ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে এবং চিকিৎসার ঘাটতিগুলি নির্ণয় করে তা পূরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

দাবি পূরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে তাঁরা বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা। একই দিনে ফুলবাগান মোড়ে ঐ ঘটনার প্রতিবাদে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন ডাঃ সজল বিশ্বাস, ডাঃ ঝোটন দাস, ভারতী রায়, অজয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

পরিচারিকাদের উদ্যোগে মেডিক্যাল ক্যাম্প দত্তপুকুরে

দত্তপুকুরের নিবাধুই উচ্চ বিদ্যালয়ে ১২ জুন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরিচারিকা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা এই ক্যাম্পে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের ডাঃ সজল বিশ্বাস, হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ডাঃ অজয় সরকার, অপটিমেট্রিস্ট গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল এবং সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির জেলা সভানেত্রী শিখা দাস।

গোসাবায় আয়লা দুর্গত নাগরিক কমিটির বিক্ষোভ

গোসাবায় সকল নদীবাঁধ মেরামত, আয়লায় ভেঙে যাওয়া ঘরের জন্য ক্ষতিপূরণের টাকা, প্রত্যেক পরিবারে পলিথিন ও কৃষকদের বীজধানের দাবিতে ২৯ জুন গোসাবা বিডিও-র কাছে আয়লা দুর্গত নাগরিক কমিটির আহ্বানে বিক্ষোভ ডেপুটেশন অনুষ্ঠিত হয়। আয়লার ২ বছর পরও গোসাবায় ৭০ শতাংশ পরিবার ক্ষতিপূরণের নামমাত্র ১০ হাজার টাকা পায়নি, বিগত ২ বছর জমি লবণাক্ত হয়ে গিয়ে ফসল হচ্ছে না। বহু পরিবার এই প্রবল বৃষ্টিতে ভাঙা ঘরে বসবাস করতে পারছে না। সর্বোপরি আয়লায় ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধ উপযুক্ত ভাবে মেরামত না করার ফলে প্রতিটি অঞ্চলের নদীবাঁধের অবস্থা ভয়াবহ। চাষিরা এবারও ফসল পাবেন কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই পরিস্থিতিতে এদিন প্রবল দুর্যোগ উপেক্ষা করে পাঁচ শতাধিক মানুষ এই বিক্ষোভ ডেপুটেশনে সামিল হন। আয়লা দুর্গত নাগরিক কমিটির পক্ষে চন্দন মাইতির নেতৃত্বে রেণুকা মণ্ডল, মণীন্দ্র জানা, আবুল গাজী, মনোরঞ্জন করণ স্মারকলিপি নিয়ে বিডিও-র সাথে সাক্ষাৎ করেন। বিডিও ৭ দিনের মধ্যে প্রধানদের দিয়ে সার্ভে করে ক্ষতিগ্রস্তদের পলিথিন এবং জরুরি ভিত্তিতে নদীবাঁধের দুর্বল জায়গাগুলি এন আর ই জি এ এবং সেচ দপ্তরকে দিয়ে মেরামত করার আশ্বাস দেন। যদিও আয়লার ক্ষতিপূরণের টাকা কতদিনের মধ্যে দেবেন তা তিনি বলতে পারেননি। এক মাসের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে নাগরিক কমিটি।

প্রোগ্রেসিভ ফিল্ম সোসাইটির চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

প্রোগ্রেসিভ ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে ২৬ জুন মেছেদা বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগারের রোকেয়া হলে এক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'সুবর্ণরেখা' এবং বাংলাদেশের পরিচালক চাষী নজরুল ইসলামের 'ওরা ১১ জন' ছবি দু'টি দেখানো হয়। চলচ্চিত্র সমালোচক ও প্রাবন্ধিক বিপ্লব চক্রবর্ত্তী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক অনিল মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন মেছেদা বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য গণেন রায়। এছাড়াও এলাকার বহু বিশিষ্টজন এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও যথেষ্ট দর্শক সমাগম ঘটে এবং যাতে ঘন ঘন এরকম ছবি দেখানো হয় দর্শকদের মধ্য থেকে সেই আবেদন আসে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রোগ্রেসিভ ফিল্ম সোসাইটির কনভেনর অরুণ জানা।

পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বীরভূম জেলার মুরারই আঞ্চলিক কমিটির বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড জার্জিস হোসেন (৬৫) দুরারোগ্য রোগে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর গত ২৬ মে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে দলের কর্মী- সমর্থকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে, অনেকেই তাঁর বাড়ি গিয়ে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড জার্জিস হোসেনের জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার বংশবাটি গ্রাম। ষাটের দশকের শেষ দিকে ঐ গ্রামে বেনাম জমি উদ্ধার ও খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে যে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার মধ্য দিয়েই কমরেড জার্জিস হোসেন এস ইউ সি আই (সি) দলের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে ঐ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলে গ্রামের জোতদাররা পুলিশ-প্রশাসনের সহায়তায় আন্দোলনের কর্মীদের উপর ব্যাপক অত্যাচার চালায় ও কয়েকজন এস ইউ সি আই (সি) কর্মীকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করে। ঐ সময়ই কমরেড হোসেন মুরারই চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং দলের কাজেও যুক্ত হন। ১৯৮৮ সালে দলের প্রথম কংগ্রেসের সময় তিনি দলের সদস্যপদ পান ও মুরারই লোকাল কমিটির সদস্য হন। এলাকার মানুষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, অনাড়ম্বর জীবন ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সাধারণ মানুষ ও কর্মী-সমর্থকদের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন।

১৯ জুন মুরারইয়ে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রফিকুল হাসান।

কমরেড জার্জিস হোসেন লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণার নলগোড়ায় এম এস এস-এর আঞ্চলিক সম্মেলন

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অল ইন্ডিয়া এম এস এস-এর নলগোড়া ১নং আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৫ জুন। সকাল থেকে প্রবল বর্ষণকে উপেক্ষা করে মহিলারা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্মেলনের শুরুতেই তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদ প্রতিম নেতা এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রয়াত প্রবীণ নেতা কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর স্মৃতিবেদি এবং সিপিএম ঘাতক বাহিনীর হাতে নিহত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড অশোক হালদার ও কমরেড মোসলেম মিস্ত্রীর শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সন্ধ্যা ভাণ্ডারী। মূল বক্তা এ আই এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা কমরেড মাধবী প্রামাণিক সমাজে নারীরা কীভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, মেয়েদের উপর এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন না গড়ে তুললে এর কোনও প্রতিকার হবে না। সেই উদ্দেশ্যে মহিলাদের নিজস্ব সংগঠন এম এস এস-কে শক্তিশালী করতে হবে। সম্মেলনে আমন্ত্রিত এস ইউ সি আই (সি)-র বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সুব্রত গৌড়ী বলেন, পুরুষশাসিত সমাজের চোখে মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, নানা ধর্মীয় অনুশাসনে আবদ্ধ। আমাদের দেশে এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মেয়েদের মুক্ত করার লড়াই শুরু করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁদের সেই স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র নলগোড়া-১নং লোকাল সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ভাণ্ডারী। কমরেড ঝর্ণা হালদারকে সভানেত্রী এবং কমরেড সুচিত্রা বৈদ্যকে সম্পাদিকা করে ৩০ জনের নলগোড়া ১নং আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

হোসিয়ারি শ্রমিকদের পূর্ব মেদিনীপুর দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন

হোসিয়ারি শ্রমিকদের উপর মালিক শ্রেণীর নানা বঞ্চনার প্রতিবাদে ২৬ জুন ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে দেউলিয়া হীরারাম হাইস্কুলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় হোসিয়ারি শ্রমিকদের দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক নেপাল বাগ ও তাপস মান্না। প্রায় তিন শতাধিক হোসিয়ারি শ্রমিক সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন।

প্রসঙ্গত জেলার কয়েকটি ব্লকে ছোট-বড় মিলে প্রায় পাঁচ শতাধিক হোসিয়ারি কারখানায় আনুমানিক পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করেন অথচ ঐ শ্রমিকদের নেই শ্রমিক হিসাবে কোনও স্বীকৃতি, নেই সরকার নির্ধারিত মজুরি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই সহ শ্রম আইন অনুযায়ী নানা প্রাপ্য বা অধিকার। তার প্রতিবাদে শ্রমিকরা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক দিলীপ ভট্টাচার্য, শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক দীপক দেব। তাঁরা বঞ্চিত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। আগস্ট মাসে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য রাইটার্স অভিযানের কর্মসূচি নেওয়া হয়।

সম্মেলন থেকে মধুসূদন বেরাকে সভাপতি এবং নেপাল বাগ ও তাপস মান্নাকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৩৩ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

গাইঘাটায় বিড়ি শ্রমিক সমাবেশ

১২ জুন শহিদ দিবসে বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার আহ্বানে উপযুক্ত মজুরি সহ অন্যান্য দাবিতে গাইঘাটা থানার সামনে বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ।

শ্রমিকরা নয়, কারখানার গেট মালিকরাই বন্ধ করে

''ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। ...''— পথের দাবী

সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এ রাজ্যে দেশের পুঁজিপতিদের এক সমাবেশে বনধ-ধর্মঘট-অবরোধের বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেছেন, শ্রমিক সমস্যা থাকলে কারখানার গেট খোলা রেখেই তার সমাধান করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী সেই সমাবেশে কিছু কথা মালিক পুঁজিপতিদের উদ্দেশেও বলতে পারতেন। যেমন, কারখানাগুলি কঠোরভাবে শ্রম-আইন মেনে চালাতে হবে, আইনসঙ্গত ও ন্যায্য পাওনা তথা ন্যায্য মজুরি থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা চলবে না, অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করা চলবে না, শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত প্রভিডেন্ট ফান্ড আত্মসাৎ করা চলবে না, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অগ্রাহ্য করা চলবে না, বেআইনিভাবে লকআউট করা চলবে না ইত্যাদি। কারখানার গেট খোলা রাখার শর্ত হিসাবে যে কথাগুলি ছিল খুবই জরুরি। অথচ মুখ্যমন্ত্রী তাদের কাছে পেয়েও তা বলতে পারলেন না।

রাজ্যের কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের দুরবস্থার কিছুমাত্র খোঁজখবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন, বিগত সিপিএম শাসনে রাজ্যের কারখানাগুলিতে শ্রমআইন লঙ্ঘন কী ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেয় না। যা দেয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির থেকেও কম। এই শ্রমিকরা গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যাদের সে সুযোগ থাকে তাদেরও কেটে নেওয়া টাকা মালিক সরকারের কাছে জমা দেয় না। স্থায়ী কাজে স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে বাড়ছে ঠিকা ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ। বছরের পর বছর মালিকরা শ্রমিকদের অস্থায়ী হিসাবে রেখে দেয়, যা কখনও এমনকী দশকের পর দশক ধরেও চলে। কোনও দাবি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে চলতেই দেখা যায় মালিক হঠাৎ লকআউট ঘোষণা করে দিয়েছে। আবার যখন মালিক তার পুঁজি অন্য কোনও কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে সরাতে চায়, তখন শ্রমিক অসন্তোষ বা লোকসান অথবা জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন, এরকম কোনও অজুহাত তুলে লকআউট ঘোষণা করে দেয়। বাস্তবে শিল্পে যত শ্রম দিবস নষ্ট হয় তার প্রায় সবই হয় মালিকদের লে-অফ, ক্লোজার, লকআউটের জন্য, শ্রমিক ধর্মঘটের জন্য হয় সামান্যই (ছক দ্রষ্টব্য)। কটন, জুট, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে দীর্ঘদিন বেতন বৃদ্ধির কোনও নতুন চুক্তি হয়নি। চা-শিল্পে দেশের মধ্যে এ রাজ্যেই শ্রমিকদের বেতন সবচেয়ে কম। মালিকরা অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। চটকলগুলিতে গত দশ বছর ধরে মালিকরা একতরফাভাবে শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন থেকে বঞ্চিত করেছে। শ্রমিক পিছু ৪০-৫০ হাজার টাকা বকেয়া রয়েছে। নতুন চুক্তিতে মালিকরা বকেয়া ডি এ-র টাকা দিতে অস্বীকার করেছে। উপরন্তু মূল বেতনও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বজবজ থেকে নৈহাটি, উলুবেড়িয়া থেকে বাঁশবেড়িয়া সর্বত্র চলছে মালিকদের এই স্বেচ্ছাচারিতা।

শ্রমিকরা কখনওই চায় না কারখানার গেট বন্ধ হয়ে যাক। তারা চায় কারখানার গেট খোলা থাকুক, মালিক শুধু তাদের ন্যায্য প্রাপ্যটুকু দিক। মালিকরা লে-অফ, লকআউট ঘোষণা করলে তার বিরুদ্ধে কারখানার গেট খোলা রাখার দাবিতেই শ্রমিকরা আন্দোলন করে। কারখানা বন্ধ হলে মালিকের লাভের পরিমাণ হয়ত কিছুটা কমে, কিন্তু শ্রমিককে তা সপরিবারে অনাহারের দিকে ঠেলে দেয়। দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকলে তাকে এমনকী সপরিবারে আত্মহত্যার পথে যেতে বাধ্য করে। কারণ মালিকরা শ্রমিককে শুধু বেঁচে থাকার মতো মজুরিটুকুই দেয়, যাতে কোনও রকমে জীবনধারণ করে সে মালিকের মুনাফা উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। তাই শ্রমিকরা কখনই চায় না কারখানা বন্ধ হোক। একমাত্র তখনই নিজের এবং পরিবারের জীবন বাজি রেখে সে কারখানা বনধের দিতে যেতে বাধ্য হয়, যখন তার কাছে আর অন্য কোনও পথ খোলা থাকে না। কারণ মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আইন থাকা সত্ত্বেও বুর্জোয়া সরকারগুলি কখনওই মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না। সরকারের শ্রম দপ্তর নামেই শ্রম দপ্তর, বাস্তবে তা মালিকদেরই দপ্তর। মালিকরা বেআইনি কাজ করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর তার পরিণতিতে শ্রমিকরা অনাহারে দিন কাটাতে, আত্মহত্যার পথে যেতে বাধ্য হয়। কংগ্রেস সিপিএম উভয় সরকারের আমলেই এ জিনিস অবাধে চলেছে। একমাত্র ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে এ রাজ্যের মানুষ শ্রম দপ্তর পরিচালনার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ করেছিল। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নেতা, শ্রমমন্ত্রী কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী ঘোষণা করেছিলেন, ন্যায়সঙ্গত শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। একমাত্র এই সময়েই মালিকরা তাদের স্বেচ্ছাচারিতা কিছুটা হলেও সংযত করতে বাধ্য হয়েছিল। মালিকদের অন্যায় জবরদস্তি ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল। সম্প্রতি আবার নয়া উদারনীতির নামে ক্রমাগত শ্রমআইনকে শিথিল করে দিচ্ছে বুর্জোয়া সরকারগুলি। আইন এমন করে তৈরি করা হচ্ছে যা মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতাকেই বৈধতা দিচ্ছে।

মালিকদের ইচ্ছামতো শ্রমিক ছাঁটাই করা, ন্যায্য প্রাপ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করা, তাদের আইনগত প্রাপ্য টাকা আত্মসাৎ করা শ্রমিকরা কোনমতেই মেনে নিতে পারে না। কারণ তা তাদের বেঁচে থাকার সাথে যুক্ত। তাই তারা ন্যায্য মজুরি, পি এফ, গ্র্যাচুইটির দাবি জানায়, লেওফ, লকআউটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। কিন্তু সরকার-পুলিশ-প্রশাসন সমস্ত কিছু মালিকের পক্ষে থাকায় শ্রমিকদের সমস্ত দাবিকেই মালিকরা হেলায় অগ্রাহ্য করে অথবা নামমাত্র কিছু দিয়ে মধ্যস্থতা করতে চায়। শ্রমিকের তখন বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা থাকে না। তার পরিণতিতে কখনও কখনও তাদের ধর্মঘটের পথেও যেতে হয়। অর্থাৎ ধর্মঘটের পথে যদি শ্রমিককে কখনও যেতেও হয় তবে তা বাধ্য হয়েই এবং মালিকই শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য করে। অথচ অর্থের জোরে, প্রচারশক্তির জোরে এর দায় মালিকরা শ্রমিকদের উপরই চাপিয়ে দিয়ে দেশের মানুষের মনোভাব তাদের সম্পর্কে বিরূপ করে তুলতে চায়।

দীর্ঘ সিপিএম শাসনে রাজ্যের কারখানাগুলিতে সিপিএম নেতারা 'শিল্পে শান্তি'র স্লোগান তুলে কার্যত শ্রমিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। তার পরিণতিতে মালিকরা এক তরফা শ্রমিকদের অধিকার হরণ করে গেছে, অবাধে ছাঁটাই করে গেছে, ত্রিপাক্ষিক চুক্তিকে ছেঁড়া কাগজের বেশি মর্যাদা দেয়নি। এর বিরুদ্ধে তীব্র শ্রমিক অসন্তোষকে সিপিএম নেতারা গায়ের জোরে অগ্রাহ্য করেছে, পুলিশ দিয়ে, সমাজবিরোধীদের দিয়ে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। কংগ্রেস সরকারের মতোই সিপিএম সরকারও 'শিল্পে শান্তি স্থাপন', 'উন্নয়ন', 'দেশের অগ্রগতি' ইত্যাদি গালভরা স্লোগানের আড়ালে মালিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবেই কাজ করেছে। শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে অনেক সময় মালিকদের মদতপুষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলি কারখানা বন্ধের জন্য সিপিএমের 'জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন'-এর কথা বলে, যা বাস্তবে সত্যি নয়। কারণ সিপিএম জঙ্গি আন্দোলন তো দূরের কথা, ন্যায্য আন্দোলন থেকেও শ্রমিকদের বিরত করেছে। তারা শিল্পে শান্তিই রক্ষা করেছে, শ্রমিকদের লড়তে দেয়নি। তাদের শ্রমিক সংগঠনগুলি মালিকের এজেন্ট হিসাবে শ্রমিক আন্দোলনকে ভিতর থেকে নিবীর্য করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। বিগত নির্বাচনে তাই গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে শ্রমিকরা সিপিএমের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে।

আজও রাজ্যের কারখানাগুলিতে পুরনো সরকারের ঐতিহ্যই চলছে। শ্রমিকরা ভেবেছিল, মালিকের স্বার্থরক্ষাকারী সরকারের পরিবর্তনের দ্বারা তাদের 'ভাগ্যেরও' পরিবর্তন ঘটবে। দেখা যাচ্ছে, নতুন সরকারের আমলেও মালিকদের বিরুদ্ধে বক্তব্য না রেখে শ্রমিকদের উপরই মিথ্যা দোষারোপ করা হচ্ছে। অথচ আজ প্রয়োজন নিরন্ন-বুভুক্ষু-বঞ্চিত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো, যাতে তাদের কেউ বঞ্চিত করতে না পারে তা সহানুভূতির সাথে দেখা, মালিকদের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া এবং আইন করে লে-অফ, লকআউট নিষিদ্ধ করা। রাজ্যের শ্রমিকদের আশা, নতুন সরকার মালিকদের তোষণ না করে তাদের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা নেবে।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘটের চেয়ে লকআউটের সংখ্যা অনেক বেশি

সাল	ধর্মঘটের সংখ্যা	ধর্মঘটের জন্য শ্রমদিবস নষ্ট (লক্ষ)	লকআউটের সংখ্যা	লকআউটের জন্য শ্রমদিবস নষ্ট (লক্ষ)
২০০২	৩০	১১.৯	৩৪৬	২০৬.৮
২০০৩	৩২	১৫.৫	৩৫১	২৪৮.১
২০০৪	২০	১৬.৬	৩৫৪	২৪৩.৮
২০০৫	২৬	৩১.১	৩৫৭	২২৩.৩
২০০৬	৯	২.৪	২৬৫	১৮৭.৫
২০০৭	১১	১৩৩.৫	২৭৬	১৭১.৪
২০০৮	১২	৩৮	২৬০	১৫৭
২০০৯	১০	৩৯.৬	২৬৩	১৫২.৫

পঃ বঃ সরকারের শ্রমদপ্তরের রিপোর্ট, ২০০৯

শ্রমমন্ত্রীর কাছে এ আই ইউ টি ইউ সি নেতৃবৃন্দের স্মারকলিপি পেশ

এ আই ইউ টি ইউ সি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল ১০ জুন রাজ্য সরকারের শ্রমমন্ত্রীর সাথে দেখা করে স্মারকলিপি পেশ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা, রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস সমর সিনহা ও দীপক দেব।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক সমাজ সহ সাধারণ মানুষের রায়ে রাজ্যে শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছে। সিপিএম ফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করে বর্তমান সরকারের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষের স্বার্থবাহী শ্রমিকবিরোধী পূর্বতন সরকারের শ্রমনীতির বিরুদ্ধে এ রাজ্যের জনগণ তাদের মত প্রকাশ করেছে।

স্মারকলিপিতে তাঁরা জানিয়েছেন, সিপিএম ফ্রন্ট সরকার তাদের দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসনে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা ও তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার নীতিটি কার্যত পরিত্যাগ করেছিল। শ্রমিকদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করতে করতে তারা কর্তৃপক্ষ ও মালিকশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থরক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ পুঁজির মালিকদের প্রতি তাদের সার্বিক আনুগত্য প্রমাণিত হয়েছে। প্রশাসনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রেও সিপিএম সরকার আমলাতন্ত্র, পুলিশ ও বৃহৎ ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির অশুভ জোটকে সমর্থন করে গেছে। ফলস্বরূপ, মজুরি, শ্রমের সময়, সামাজিক সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন অধিকার, যেগুলি দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা অর্জন করেছেন, সেগুলির মর্যাদা এই সরকার রক্ষা করেনি। প্রায় প্রতিটি শিল্পক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছভাবে শ্রমআইন ভঙ্গ করেছে। পূর্বতন সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি পঞ্চদশ সর্বভারতীয় শ্রম সম্মেলনের সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তো নয়ই, বরং তা থেকে অনেক কম। শ্রমিকদের জন্য সরকার যেটুকু মজুরি ঘোষণা করেছিল, পুঁজিপতিদের কল্যাণে সেটুকুও শ্রমিকদের জুটত না। সর্বোপরি, ন্যায়সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর মালিকশ্রেণীর স্বার্থে পুলিশি আক্রমণ, আন্দোলনকারী শ্রমিক নেতা ও শ্রমিকদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো — সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের আমলে অহরহ ঘটেছে। এক কথায় বলতে গেলে, পূর্বতন রাজ্য সরকার একদিকে বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে গেছে এবং অন্যদিকে শ্রমিকদের ঠেলে দিয়েছে দারিদ্র্যের পথে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, শিল্পশ্রমিকদের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালের এইচ আর এ-র হার নির্ধারিত হয়েছিল ৫ শতাংশ। গত ৩৩ বছরে সমস্ত জিনিসের বিপুল মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও এই হারের কোনও পরিবর্তন হয়নি। শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে ২৫ শতাংশ হারে এইচ আর এ দাবি করে আসছে। সংগঠনের পক্ষ থেকেও এই হার দ্রুত বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে, নতুন সরকার ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে বলে স্মারকলিপিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। তা না হলে মেহনতি মানুষের কাছে এ কথাই আবার প্রমাণিত হবে যে, সরকারের পরিবর্তন হলেও মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী নীতির পরিবর্তন হয় না।

দূষণ প্রতিরোধে মন্ত্রীকে ডেপুটেশন

হাওড়া জেলার ঘোড়াঘাটায় কৃষ্ণা টিস্যু প্রাইভেট লিমিটেডের বর্জ্য জল ও ছাইজনিত দূষণ প্রতিরোধে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে কৃষ্ণা টিস্যু দূষণ প্রতিরোধ কমিটি ও সারা বাংলা ফুল ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে ২৩ জুন রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন ও ছয় দফা দাবি সংবলিত এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। তাতে অভিযোগ করা হয়, ২০০৭ সালে ঐ পেপার মিল গঠিত হওয়ার পর থেকে মারাত্মক দুর্গন্ধ যুক্ত বর্জ্য জল ও ধোঁয়ায় হাজার হাজার মানুষ দূষণে আক্রান্ত হচ্ছে। এ ছাড়াও এলাকার প্রধান অর্থকরী ফসল ও ফুলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন দূষণ প্রতিরোধ কমিটির প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আশুতোষ সামন্ত, যুগ্ম সম্পাদক আবুল হোসেন খলিফা ও নিখিলরঞ্জন বেরা এবং সারা বাংলা ফুল চাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়েক। মন্ত্রী দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যানকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দৈন্য দশা

একের পাতার পর

অর্থনৈতিক সংকট তা বোঝা দুঃসাধ্য নয়। এই মৃত্যু সামনে এনে দিয়ে গেল, শাসকবর্গ উন্নয়নের যে ডঙ্কা বাজায় তা কত অন্তঃসারশূন্য। মানুষ উন্নয়নের নামে বক্তৃতার ফুলঝুরি চায় না। সে উন্নয়ন হাতে কলমে দেখতে চায়। সে কাজটা শুরু হোক চিকিৎসার যথাযথ পরিকাঠামো গঠন করার মধ্য দিয়ে এবং তা শুধু কলকাতায় নয়, অন্যান্য জেলাতেও।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ত্রিপুরায় পৃথকভাবে বনধ এস ইউ সি আই (সি)-র

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৭ জুন পৃথকভাবে ত্রিপুরা বনধ পালন করল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। ত্রিপুরায় কিছুদিন আগেই সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার পেট্রোল ও ডিজেলে যথাক্রমে ১৫ ও ২০ শতাংশ ভ্যাট বাড়িয়েছে। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ সভা চলছিল। তার উপর ২৪ জুন মধ্য রাতে কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার ডিজেল, কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দেয়। রাজ্যের মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ আঁচ করে সিপিএম ২৭ জুন ১২ ঘণ্টা ত্রিপুরা বনধের ডাক দেয়। এই ঘটনা রাজ্যবাসীকে বিস্মিত করে। আন্দোলনের নামে সিপিএমের এই দ্বিচারিতা নগ্ন করে দিতে এবং সত্যিকারের আন্দোলনের লাইন তুলে ধরতে ২৭ জুন এস ইউ সি আই (সি) পৃথকভাবে ত্রিপুরা বনধের ডাক দেয় এবং আগরতলা সহ বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক প্রচার চালায়। বনধ সর্বাত্মক সফল হয়। এস ইউ সি আই (সি) ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনী কমিটি ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে পরিবহনের ভাড়া বাড়ানোর তীব্র বিরোধিতা করেছে।

বিজয়গড় কলেজে ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের জয়

লাগাতার এবং দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে কলকাতার বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের মাসিক ফি কমাতে বাধ্য হল কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের ফি-বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ডি এস ও দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছিল। ১৫ জুন সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে ফি কমানো, কলেজের পরিকাঠামোর উন্নতি এবং সমস্ত বিভাগে আসন সংখ্যা বাড়ানোর দাবিতে অধ্যক্ষকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ২৫ জুন কর্তৃপক্ষ ফি কমানোর কথা ঘোষণা করেন। বিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে ফি ৩৪০ টাকা থেকে কমে ৩১০ টাকা ও পাস কোর্সে ১১৫ টাকা থেকে ৮৫ টাকা এবং কলা বিভাগে অনার্সে ১০৫ টাকা থেকে কমে ৭৫ টাকা ও পাস কোর্সে ৮০ টাকা থেকে কমে ৫০ টাকা করা হয়েছে। বাকি দাবিগুলিও কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। সংগঠনের পক্ষে কমরেড বাপি দাস বলেন, বাকি দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এর আগেও ডি এস ও-র আন্দোলনের চাপে কলেজ কর্তৃপক্ষ আয়লাদুর্গত ছাত্রছাত্রীদের ফি মকুব করতে বাধ্য হয়েছিল।

বিহারে অ্যাসবেসটস কারখানা স্থাপনের প্রতিবাদ

১৮ জুন বিহারে মুজফ্ফরপুরে কৃষিজমিতে অ্যাসবেসটস কারখানা স্থাপনের বিরুদ্ধে 'খেত বাঁচাও জীবন বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি'র বিক্ষোভ

বিহারের বৈশালী জেলার গোড়াউল ব্লকের রামপুর রাজধারী চকসুলতান (পানাপুর), এলাকায় প্রস্তাবিত অ্যাসবেসটস কারখানার প্রতিবাদে ১৩ জুন খেত বাঁচাও জীবন বাঁচাও সংঘর্ষ কমিটির উদ্যোগে ডি এম অফিসের সামনে ধর্না অনুষ্ঠিত হয়। সিটিজেন্স ফোরাম এগেনস্ট অ্যাসবেসটস-এর সদস্য রাজ কুমার চৌধুরী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু), আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (আই এল ও)-র অ্যাসবেসটস নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, পানাপুরের জনবহুল এলাকায় এবং উর্বর ও সেচ ব্যবস্থা আছে এমন জমিতে বিপজ্জনক অ্যাসবেসটস কারখানা গড়ার জন্য রাজ্য সরকারের সবুজ সঙ্কেত সম্পূর্ণ জনবিরোধী। তিনি বলেন, যেখানে বিশ্বের ৫৫টি দেশে মারণরোগ ক্যান্সার সৃষ্টিকারী অ্যাসবেসটসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেখানে এ রাজ্যে তার অনুমোদন দিচ্ছে সরকার। অ্যাসবেসটস কারখানা গড়ার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে লাগাতার, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করতে প্রত্যেক মানুষেরই এই আন্দোলনে অংশ নেওয়া উচিত। খেত বাঁচাও জীবন বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক অজিত কুমার সিং বলেন, পানাপুরের মানুষ এই কারখানা করার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রস্তুত। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ইন্দ্রদেও রায়, সংগঠনের বৈশালী জেলা সম্পাদক কমরেড ললিত কুমার ঘোষ, সি পি আই (এম এল)-এর বৈশালী জেলা সম্পাদক কমরেড ত্রিভুবন রায় প্রমুখ। খেত বাঁচাও জীবন বাঁচাও সংঘর্ষ কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রামপুকর রায় ধর্নায় সভাপতিত্ব করেন। পরে কারখানা বন্ধ করার দাবিতে বৈশালীর ডি এম-র কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ

এ আই ডি এস ও দিল্লি রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ছাত্ররা ২৮ জুন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। বিবেকানন্দ মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল করে তাঁরা উপাচার্যের দপ্তরের সামনে পৌঁছান। সেখানে এক বিক্ষোভ সভায় বিভিন্ন কলেজের ছাত্র নেতারা বক্তব্য রাখেন। উপাচার্যের কাজে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সভা পরিচালনা করেন জাকির হোসেন কলেজের নেতা কমরেড আসিফ। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের দিল্লি রাজ্য সভাপতি কমরেড ভাস্করানন্দ, সম্পাদক কমরেড প্রশান্ত কুমার, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি কমরেড দীপক রঞ্জন ঝা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাহুল সরকার, হিন্দু কলেজের নেতা কমরেড নীরাজ, কিরোরিমল কলেজের কমরেড রবি কুমার, সত্যবতী কলেজের কমরেড প্রবীণ এবং সত্যবতী কলেজের সান্ধ্য বিভাগের কমরেড কৃষ্ণেন্দু মুখার্জী প্রমুখ। বক্তারা ফি বৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বিভিন্ন কলেজে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন কলেজ স্থাপন এবং হোস্টেল নির্মাণের দাবি জানান।

ওড়িশা সরকার ও মিত্তালের মউ বাতিলের দাবিতে গণঅবস্থান

১০ জুন কেওনঝর কালেক্টরেটের সামনে মিত্তাল প্রতিরোধ মঞ্চ এবং এ আই কে কে এম এস-এর যৌথ গণঅবস্থান হয়। খনি, জল, জঙ্গল এবং চাষযোগ্য জমি পুঁজিপতিদের দেওয়ার প্রতিবাদে এবং চাষিদের জমির পাট্টা দেওয়ার দাবিতে ও ওড়িশা সরকার ও আর্সেলর মিত্তালের মধ্যে স্বাক্ষরিত মউ বাতিলের দাবিতে একটি সুসজ্জিত মিছিল কেওনঝর কালেকটরেট অফিসের সামনে আসে এবং সেখানে একটি সভা হয়। মিত্তাল প্রতিরোধ মঞ্চের সভাপতি মুরলীধর সর্দার সভাপতিত্ব করেন। মঞ্চের উপদেষ্টা এবং এ আই কে এম এস ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড রঘুনাথ দাস কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলি বিশ্লেষণ করে জনসাধারণের সমস্যা, বিশেষ করে কৃষকদের সমস্যা নিয়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন মহেশ্বর নায়েক, মিত্তল প্রতিরোধ মঞ্চের সম্পাদক লক্ষ্মীধর মহন্ত, এ আই কে কে এম এস নেতা কমরেড প্রহ্লাদ বর্মা, কমরেড রেণুধর সর্দার প্রমুখ। কেওনঝরের কালেকটরের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করেন ঘনশ্যাম মোহন্তের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

বিহারে সি বি এস ই ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ তীব্র নিন্দায় ডি এস ও

পাটনায় উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে বিক্ষোভরত সি বি এস ই-র দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের উপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এর প্রতিবাদে ১৫ জুন ডাকবাঙা চৌরাস্তায় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের কুশপুতুল পোড়ায় ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও। গান্ধী ময়দানে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তির সামনে থেকে স্লোগানে মুখরিত ছাত্রদের মিছিল শুরু হয়ে বিক্ষোভস্থলে পৌঁছায়।

সেখানে সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আই ডি এস ও বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড সূর্যকুমার জিতেন্দ্র বলেন, বর্বর লাঠিচার্জের মধ্য দিয়ে নীতীশ কুমার সরকারের ছাত্রবিরোধী চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

অন্যান্যদের মধ্যে ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস অনিল কুমার, পাটনা জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড কাঞ্চনকুমারী, সম্পাদক কমরেড সরোজ কুমার সুমন, অফিস সম্পাদক কমরেড নিকোলাই শর্মা বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেকেই ছাত্রদের উপরে পুলিশি বর্বরতার নিন্দা করেন এবং অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের শাস্তির দাবি জানান। এ ছাড়া উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের দাবি জানানো হয়।

ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাসের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকে দেশের প্রান্তে প্রান্তে বিক্ষোভ

বিহারের মুজফ্ফরপুর

গুজরাটের আমেদাবাদ

হরিয়ানার রেওয়ারি

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

বিপ্লবী আচরণ ও শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব

(৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস উপলক্ষে মহান নেতার শিক্ষা থেকে কিছু অংশ প্রকাশ করা হল।)

...আজকাল একথাটা বলা একটা রেওয়াজ হয়েছে যে, আমাদের দলের তত্ত্ব খুব ভালো। একথাটা আমরাও শুনছি ঘুমপাড়ানি গানের মতো। শুধু আমাদের দলের কর্মীরা একথা বলছেন তাই নয়, বাইরের লোকও বলতে শুরু করেছেন, তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কর্মীদেরও অনেকেই বলতে শুরু করেছেন। জেনুইন অ্যাপ্রিসিয়েশন থেকেই তাঁরা বলছেন। ... আমাদের কর্মীরাও বলেন, আমাদের বিশ্লেষণ খুব ভাল, তত্ত্ব সঠিক, খুব সঠিক। তা আমি বলি, তত্ত্ব যখন আমাদের সঠিক, তখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমান! আমাদের বিপ্লবী তত্ত্ব যখন সঠিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ যখন সঠিক, তখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে! বিপ্লব তো আপনাআপনিই হয়ে যাবে, সঠিক তত্ত্বের ফলেই বিপ্লব আপনাআপনি হয়ে যাবে! না, তা হয় না। এইজন্যই আমি দেখাতে চাইছি, নভেম্বর বিপ্লবের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী শিক্ষা হল এই যে, শুধু তত্ত্ব সঠিক হলেই হয় না, চাই তত্ত্বকে কার্যকর করার উপযোগী শক্তিশালী বিপ্লবী দল, চাই উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যাপক বিপ্লবী সংগঠক ও কর্মীবাহিনী। না হলে সঠিক তত্ত্ব আপনাআপনিই বিপ্লব করে দেবে না।

এই যে বিপ্লব সম্পর্কে মানবিক আবেদন বা মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে অনেক বড় কথা জানছি, শিখছি, কেন শিখছি? শিখছি রাজনীতি, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতি আয়ত্ত করার জন্য; আর, সেই রাজনীতি শ্রমিকশ্রেণী সহ সমস্ত অংশের মেহনতি মানুষকে বুঝিয়ে তাকে বিপ্লবী সংগঠনে সংঘবদ্ধ করার জন্য। তা না হলে, মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করা, সংস্কৃতি অর্জন করা, এসবের দরকার কী? মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, মহানুভবতা, প্রগাঢ় জ্ঞান, বিরাট পাণ্ডিত্য, এসবের অর্থ কী? এসবের প্রয়োজন কী, যদি সর্বহারা সংস্কৃতি কী, দলের বিশেষ রাজনীতিটা কী, বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্যান্য রাজনীতির সঙ্গে এই রাজনীতির লড়াই কোথায়, সে সম্পর্কে আমাদের কোনও জ্ঞান না থাকে? শুধু জয়ের মধ্যেই নয়, ব্যর্থতার মধ্যে, হতাশার মধ্যে এবং অসুবিধার মধ্যেও যদি সেই লড়াই পরিচালনা করবার ক্ষমতা আমাদের না থাকে? জয় যখন হচ্ছে তখনও, আবার যখন মার খাচ্ছি, বারবার পরাজিত হচ্ছি, এমনকী তখনও বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে দলের রাজনীতিকে আমি রূপ দিতে পারি কিনা — এই ক্ষমতা অর্জন করার জন্যই তো সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, দর্শন ইত্যাদি সব শেখা — তাই না?

আর, এটি করার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য আর একটি জিনিস চাই, সেটি হচ্ছে, বিপ্লবী আচরণ ও শৃঙ্খলাবোধ। মিলিটারিতে শৃঙ্খলা মানে যাকে বলে ঠেলার নাম বাবাজি, গুঁতো দিয়ে কাজ করানো হয়। মনের থেকে কেউ মানুক আর না মানুক, যা বলছে তা করতে হবে; না হলে পয়সা পাবে না, চাকরি থাকবে না। শুধু তাই নয় একবার যদি কেউ মিলিটারিতে নাম লিখিয়েছে, পালিয়ে যেতে পারবে না, কান ধরে নিয়ে আসবে, না হয় জেলে পুরে দেবে। ফলে, মিলিটারিতে লোকে ডিসিপ্লিন মেনে চলতে বাধ্য হয়।

কিন্তু, বিপ্লবী দলের শৃঙ্খলাবোধ মিলিটারির শৃঙ্খলা নয়। এখানে সে প্রশ্নই আসে না। বিপ্লবী দলে মিলিটারির মতো ব্যাপারটা নেই এ কারণে যে, এখানে ডিসিপ্লিন ভলান্টারি, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। বিপ্লবী দলে প্রয়োজনের উপলব্ধিটাও ভলান্টারি, আমরা নিজেরা বুঝেই সেটা করি। কিন্তু, শৃঙ্খলার রূপ এখানে যান্ত্রিক নয় বলে, কেউ কি তাকে সুবিধা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে ? এটা কি একটা সুবিধা বা প্রিভিলেজ?

কিন্তু, ইদানীং দলের বেশ কিছু কর্মীর আচরণ আমাকে ভাবাচ্ছে, আমি খানিকটা উদ্বিগ্ন, আই অ্যাম এ বিট ডিস্টার্বড। কারণ, আমি দেখছি, কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় কমরেড, সাধারণ কমরেডদের কথা পরে বলছি, বহুক্ষেত্রেই কোনও দায়িত্ব পালন করেন না, শুধু গল্প-আলোচনায় সময় কাটান। তাঁদের উপর কোন দায়িত্ব আছে, বা তাঁরা কী নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিচ্ছেন, একবারও এ কথাটা সেই কমরেডরা ভাবেন না। কিন্তু, দুনিয়ার কোথায় কী ঘটছে তার খবর সংগ্রহ করতে তাঁদের খুব উৎসাহ। সমস্ত বিশ্বের বিপ্লবের ভাবনাটা তাঁদের মাথায়, কিন্তু নিজের কোনও নির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে কিনা তা নিয়ে কোনও ভাবনা নেই। তাঁরা ভাবেন না যে, তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ কোথায়, তাঁরা নিজেরা কী দায়িত্ব পালন করেন? যদি না পালন করেন, তাহলে কাজের যেমন ক্ষতি হয়, তাঁদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা যেমন বাড়ে, তেমনি আবার তাঁদের এই অভ্যাস অপরের মধ্যে বর্তাতে পারে। এরকম হলে গোটা পার্টিতে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করার প্রশ্ন কিছু থাকবে না, সবটাই কর্মীদের খামখেয়ালির বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। আর, এভাবে পার্টির কোনও ইউনিট কাজ করতে পারে না। কিন্তু, আমি ইদানীংকালে দেখছি, দায়িত্বশীল কমরেডরা পর্যন্ত অনেক সময় এ ধরনের আচরণ করেন। দ্বিতীয়ত, বহু নেতৃস্থানীয় কমরেড ডিসিপ্লিন জিনিসটা শেখেন না। আমাদের সমস্ত আচরণের মধ্যে কতকগুলো মৌলিক আচরণবোধের দিক আছে। তাঁরা যদি সেগুলো না মানেন, তাঁদের যদি ডিসিপ্লিন না থাকে, তাহলে তাঁরা যে লোকগুলোকে জড়ো করছেন সেই লোকগুলো কী শিখবে? সেই লোকগুলো যে লড়াই করছে, সে লড়াইয়ের মূল্য কী? অসুবিধার সময় বা হঠাৎ একটা আক্রমণের মধ্যেও সমস্ত কিছু সহ্য করার ক্ষমতা ও শিক্ষা তারা কোথায় পাবে?

পছন্দ না হলেই 'রিঅ্যাক্ট' করব, আমার সঙ্গে কোনও বিষয়ে মতবিরোধ হলেই উল্টোপাল্টা বলতে থাকব, মনোমতো না হলেই আড়ালে-আবডালে আলোচনা করতে থাকব, এই যে সব পেটিবুর্জোয়াসুলভ বদভ্যাস, এগুলো আমাদের চরিত্রের নেতিবাচক দিক। আমরা সমাজ থেকে এগুলো পেয়েছি। এগুলো দেখে ভীত হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু, বোঝা দরকার, এগুলো আমাদের দুর্বলতার দিক, আমাদের ত্রুটির দিক, আমাদের চরিত্রের নেতিবাচক দিক। ফলে, এগুলো দূর করতে হবে। কিন্তু, চরিত্রের এই নেতিবাচক দিকগুলোকে দূর করার শিক্ষা আমরা কোথা থেকে পাব যদি আমরা ডিসিপ্লিন না শিখি, যদি আমাদের আচরণ বিপ্লবী কর্মীসুলভ না হয়? বিপ্লবের সামগ্রিক স্বার্থে এ শিক্ষা তো আমাদের থাকা দরকার।

এমন অনেক সময় ঘটতে পারে যে, কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কোনও বডিতে কমরেডদের মধ্যে মতবিরোধ হতে পারে, ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে। কারও ভুলের জন্যও এ ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু, এক্ষেত্রে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে, যার ভুলের জন্যই হোক, হয়তো তিনি ঠিক, কিন্তু সিদ্ধান্ত তাঁর মনোমত হচ্ছে না, তা সত্ত্বেও বডি'র সিদ্ধান্ত তাঁকে মেনে নিতে হবে। সেখানে বিষয়টা মেজর না মাইনর, মৌলিক তত্ত্বগত বিষয় তার সাথে জড়িত, নাকি তাৎক্ষণিক সাধারণ কোনও একটা সমস্যা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার, ইত্যাদি বিষয়গুলো বিচার করেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করতে হয়। কিন্তু, এই দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের মনোভাব এমন হবে যে, আমার সঙ্গে মতবিরোধ হলেও আমার ডিসিপ্লিন বজায় রাখা উচিত, যাতে এটা দলের মধ্যে একটা শিক্ষা হিসাবে কাজ করতে পারে। যাতে অপরে দেখতে পায় যে, দেখ কমরেডটি নিজে যা ঠিক মনে করেছে তা নিয়ে নিজের সপক্ষে লড়বার সময় সে আলাদাভাবে লড়েছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর সে সিদ্ধান্ত খুশি মনে মেনে নিয়েছে। তাঁর মতটা মানা হল না বলে তখন যদি অন্য কেউ তাকে সহানুভূতি দেখাতে যায়, সে তাকে উল্টে চেপে ধরে বলে, আমি কি ওখানে ব্যক্তিগত মত জাহির করার জন্য লড়েছি? আমি যেমন বুঝেছিলাম তেমন মতামত নিয়ে আমি লড়াই করেছি। কিন্তু, এখন যে সিদ্ধান্তটা হয়েছে সেটা পার্টি সিদ্ধান্ত এবং আমরা সকলেই সে সিদ্ধান্তের শরিক। ফলে, তুমি আমাকে সহানুভূতি দেখাতে এসেছ কেন? তুমি কি মনে করছ, এসব আচরণে আমি উৎসাহ দেব? এই হবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ। এ জিনিস যদি তিনি না করেন, এই ডিসিপ্লিনবোধ যদি তাঁর না থাকে, যদি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে অন্য কমরেডরা কী শিখবে? অন্য কমরেডরা যদি দেখে যে, নেতৃস্থানীয় একজন কমরেড, বড় বড় কথা তিনি যাই বলুন, কার্যক্ষেত্রে তিনি এরকম উল্টোপাল্টা আলোচনা করেন, তাঁর মতামত নিয়ে গুজগুজ করেন, অসন্তোষ প্রকাশ করেন — তখন ঐ সমস্ত কমরেডদের উপর তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হয়?...

সুতরাং, কাজ করা মানে কি কতকগুলো বক্তৃতা করা, আর কতকগুলো লোকের সঙ্গে মিশতে পারা? এর নাম কি ভালো কর্মী, বিপ্লবী কর্মী? বিপ্লবীদের প্রধান কথা হল, সে পার্টির রাজনীতি ভালো বোঝে এবং স্বেচ্ছায় ডিসিপ্লিন মেনে চলে। সে জানে, কীভাবে শৃঙ্খলার সাথে আচরণ করতে হয়। নিজেকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে, নিজের উপর তার কন্ট্রোল আছে এবং সে ডিসিপ্লিন অনুযায়ী কাজ করে।

এখন, পার্টির যত শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে তত এটি আমাদের একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। কারণ, ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি কমরেডের দিকে নজর দেওয়া নেতৃত্বের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে। কঠিন যে হচ্ছে, সেটা আমরা বুঝি। দল যখন ছোট থাকে, একটা ছোট গোষ্ঠী থাকে, তখন প্রত্যেকটি কমরেডের উপর নজর দেওয়া যায়। কিন্তু, দল যত বড় হতে থাকে তখন যারা ঘটনাচক্রে নেতৃত্বের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে তাদের উপরে যতটা নজর পড়ে, যারা সব সময় আশেপাশে ঘোরাফেরা করে না তাদের উপর ততটা নজর পড়ে না। আবার, যারা আশেপাশে ঘোরাফেরা করে আগে তাদের উপর যতটা নজর দেওয়া সহজ হতো, কাজকর্মের বিস্তৃতির ফলে আজ তাও সম্ভব নয়। এ কারণেই সমগ্র পরিবেশটি এমন হওয়া দরকার এবং প্রতিটি নেতা, কর্মী, সংগঠকের কর্মপ্রণালী এমন হওয়া দরকার যাতে একের আচরণ অপরকে শেখায়, একের ডিসিপ্লিন অপরকে ডিসিপ্লিন সম্পর্কে ভাবায়।

আবার, অনেক সময় দেখা যায়, গুরুতর আলোচনার ক্ষেত্রে অনেকে গল্পগুজব ঠাট্টা করেন, ইয়ারকি করেন। বিপ্লবীরা ঠাট্টা করে, মানে কি ইয়ারকি করে? ইয়ারকির একটা আলাদা মানসিকতা আছে, তা ডিসিপ্লিনের ভিতকে আলগা করে দেয়। অনেক সময় নেতারা কথা বললে, সমালোচনা করলে দেখা যায়, একজন কর্মী আরেকজনের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপেন, মুচকি হাসেন। ভাবখানা এমন যে, কত কথা আর শুনব, কত সমালোচনা আর শুনব — মানে, সমালোচনা এমন একটা কিছু নয়, ও বলেই থাকেন নেতারা। এইরকম কর্মীও কিছু আছে। তাদের এইসব আচরণ আমার চোখে যতটুকু পড়ে তার থেকেই বোঝা যায় যে, আমার চোখের সামনেই যা ঘটে তা যদি এই হয়, তাহলে বাস্তবে এর ব্যাপকতা আরও অনেক বেশি। আবার অনেকে ভাবেন, তাঁরা বেশি বুদ্ধিমান। তাঁরা হয়তো ভাবেন, আড়ালে গিয়ে চোখটি টিপলে বা সমালোচনার সময় মুখখানা গম্ভীর করে চলে গেলে সকলে মনে করবে, তিনি খুব গুরুত্বের সাথে নিলেন ব্যাপারটা। কিন্তু, যাঁরা বোঝার তাঁরা বোঝেন। পার্টি নেতৃত্ব এত দুর্বল নয়। তাঁরা এসব বুঝতে পারেন।

আমি এই সমালোচনাগুলো করছি এই জন্য যে, আজকে আমরা যে জায়গায় এসেছি, এটা একটা উত্তরণের সময়। পার্টি জোর কদমে এগিয়ে যাওয়ার মতো জায়গায় এসেছে। আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অনেক কর্মী আমাদের। কিন্তু, অনেকেরই ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেই। অনেকে বল ভরসা পাচ্ছে না। বিপ্লবী কর্মীরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে; কিন্তু আলোচনা করে মানে পরস্পরকে কাজ করার সাহস জোগায় একত্রে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য, দায়িত্ব পালন করবার জন্য। আরেক ধরনের আলোচনা আছে, তাহল, কেন পারব না, কিসের জন্য পারব না, না পারার পেছনে কী কী কারণ, বা যুক্তি কী, সেগুলো বড় করে দেখানোর জন্য আলোচনা করা। এ ধরনের আলোচনা কর্মীদের উদ্যোগ নষ্ট করে, কর্মক্ষমতা মেরে দেয়; তাদের পার্টিজীবনের সামনে সামগ্রিকভাবে যে সম্ভাবনাগুলো দেখা দেয়, তাকে নষ্ট করে দেয়।

তাহলে এই কি আমাদের আলোচনার বা আমাদের মেলামেশার উদ্দেশ্য হবে? কমরেডদের মধ্যে মেলামেশার উদ্দেশ্য হল, আমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে সেগুলো কাটিয়ে আমরা যা পারব না বলে ভাবছি তা করার দায়িত্ব যদি আমাদের উপর আসে সাহসের সঙ্গে তা গ্রহণ করা এবং তার জন্য চেষ্টা করা। আমরা বসে আড্ডা দিই একে অপরকে উৎসাহিত করার জন্য বা ভয় ভাঙাবার জন্য, অপরের মধ্যে উদ্যমের অভাব থাকলে তা দূর করবার জন্য, উদ্যম গড়ে তোলার জন্য, উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য। তা না হলে যৌথ উদ্যোগ কথাটার কোনও মানে থাকে না। যৌথ উদ্যোগ একটা যান্ত্রিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, প্রাণহীন হয়ে দাঁড়ায়, যদি না তার মূলে থাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ। ব্যক্তিগতভাবে যে যেমন সচেতন কর্মীই হোন, তিনি বিপ্লবী হয়েছেন মানেই তিনি তাঁর পরিবেশকে পরিবর্তিত করতে সাহস করেন, সৎসাহস রাখেন। তিনি বুঝেছেন, একজন সচেতন মানুষ হিসাবে তাঁর পরিবেশকে পরিবর্তন করার, তাকে নতুন রূপ দেওয়ার জন্য তাঁকে সংগ্রাম করতেই হবে। এর জন্য তিনি কোনও অজুহাত দিতে পারেন না, পালিয়ে যেতে পারেন না। তাঁকে পরিবেশ পরিবর্তন করার জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ, ব্যক্তিগত উদ্যোগই যৌথ উদ্যোগের বুনিয়াদ। প্রতিটি বিপ্লবী কর্মীকেই এভাবে চিন্তা করতে হবে।

(অন্ধ অনুকরণ করে বিপ্লব করা যায় না — নির্বাচিত রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড)

নারীর নিরাপত্তাহীনতায় ভারতের বিশ্বরেকর্ড

লোকসভা-বিধানসভায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে দেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বাণী দিতে সংসদীয় দলগুলি যখন ব্যস্ত, তখন ভারতের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব মধুকর গুপ্তের প্রকাশিত এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ভারতে শুধু ২০০৯ সালে পাচার হওয়া নারী-শিশু সমেত প্রায় ১০ কোটি মানুষ যুক্ত ছিল পাচার কারবারের সঙ্গে। অবশ্য পাচার হওয়া নারী-শিশুর সঠিক সংখ্যা সরকারি হিসাবে পাওয়া যায় না (সূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস, ২০-৬-১১)। এই তথ্য থেকে আরও জানা যায়, নারী পাচারের ন্যক্কারজনক ঘটনার সামনে ও পিছনে রয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের লম্বা হাত। নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার সঙ্গেও এ দেশের পুলিশ-প্রশাসন, এমএলএ, এমপি, এমনকী মন্ত্রীরা পর্যন্ত যুক্ত। মণিপুরের মনোরমা, উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরের চোদ্দ বছরের সোনমের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা সহ অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগের আঙুল ওঠে খাকি উর্দি পরা সমাজরক্ষক (!) পুলিশ-প্রশাসকদের দিকে। উত্তরপ্রদেশে সি এম ও হত্যাকাণ্ড ও নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে স্বয়ং বি এস পি সাংসদ ধনঞ্জয় সিং যুক্ত; আর সদ্য ঘটে যাওয়া দিল্লির দুই তরুণীকে ধর্ষণের প্রচেষ্টায় অভিযুক্ত উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এক কর্মী, বহুজন সমাজ পার্টির বিধায়ক শাহনওয়াজ রানার ব্যক্তিগত দুই দেহরক্ষী এবং বি এস পি সাংসদ কাদির রানার দুই আত্মীয়। অর্থাৎ দেশের রক্ষকরাই এখন ভক্ষকের ভূমিকায়। সংবিধানে-আইনে এ দেশের মেয়েদের সমানাধিকার দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা থেকে গেছে খাতায় কলমেই। ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের নিরাপত্তা যখন ক্রমশই কমছে, নিজের মা-বোন-মেয়ে বাইরে বেরোলে, বিশেষত সন্ধ্যার পর বেরোলে সম্মান নিয়ে বাড়িতে ফিরবেন কি না সে আশঙ্কায় যখন প্রহর গুনতে হয় তখন এই সমাজ ও শাসনব্যবস্থার সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেই। নারীর নিরাপত্তাহীনতায় বিশ্বের চতুর্থ বিপজ্জনক দেশ ভারত।

এ দেশে ভ্রূণ অবস্থা থেকেই শুরু হয় নারীনিধন যজ্ঞ। ধনী ও তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারেই এ ঘটনা সবচেয়ে বেশি। পরিবারে একটি কন্যাসন্তান থাকলে এঁরা দ্বিতীয়টি চান না, ভ্রূণ পরীক্ষা করে গর্ভে কন্যাভ্রূণ রয়েছে জানলেই তাকে হত্যা করেন। এদের চিন্তা পুরুষ সন্তান না হলে ধন-সম্পত্তি ও বংশ রক্ষা পাবে না। গরিব ঘরে কন্যাভ্রূণ হত্যার সংখ্যা কম, কারণ ভ্রূণ পরীক্ষা করে প্রসবের আগেই লিঙ্গ জেনে নেওয়ার সুযোগ বা অর্থবল তাদের নেই। তাছাড়া গরিবের ঘরে কন্যা অনাকাঙ্ক্ষিত গরিবির জন্যই। কন্যা সেখানে বোঝা, বিবাহ দিয়ে তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পণ দিতে যে অর্থ দরকার, গরিব পিতামাতার তা নেই। তাই গরিব পরিবারের মেয়েরাই 'নিখোঁজ' হয়ে যায় বেশি। রাষ্ট্রসংঘের 'পপুলেশন ফান্ডে'র তথ্য অনুসারে গত শতকে আনুমানিক ৫ কোটি শিশুকন্যা নিখোঁজ হয়েছে এ দেশে। এদেশে কন্যাভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে আইন আছে, আইন আছে পণপ্রথার বিরুদ্ধেও, কিন্তু বাস্তবে নেই তার প্রয়োগ। নারী পাচারেও এ দেশ বিশ্বরেকর্ডের তালিকায় উপরের দিকে স্থান করে নিয়েছে। পুলিশের চোখের সামনে দিয়েই শুধু নারী পাচার হয় তাই নয়, সরাসরি পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারা নারী পাচার হয় — এমন চাঞ্চল্যকর রিপোর্টও উঠে এসেছে বিভিন্ন সমীক্ষায়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে পুলিশ-প্রশাসনের মাধ্যমে এবং পরোক্ষে তাদের মদতে নারী পাচারের ঘটনা ঘটে। কারণ নারী পাচারের ব্যবসায় প্রচুর টাকার আমদানি হয় এবং ব্যবসাটি বিনা পুঁজিতে লাভজনকও বটে। আর যে নারীর বয়স যত কম, তার দাম তত বেশি, তাই দেখা যায় গ্রাম-গঞ্জের গরিব পরিবারের বেশিরভাগ নাবালক মেয়েদের নানা প্রলোভনে ভুলিয়ে পাচার করা হয় ভিন রাজ্যে, অন্য দেশে।

পাচার ছাড়াও মেয়েরা আরও নানা আক্রমণের শিকার হন অহরহ। শ্লীলতাহানি, খুন, ধর্ষণ নিত্যদিনের ঘটনা, ঘরের ভিতরেও মান-সম্মানহীন ভয়ত্রস্ত জীবনযাপন করতে তাদের বাধ্য করা হয়। অর্থাৎ ঘরে-বাইরে কোথাও তারা সুরক্ষিত নয়। কারণ পুরুষশাসিত সমাজের ভিত্তিতেই রয়েছে নারীর স্বাধিকার হরণের ইতিহাস। পুঁজিবাদী সমাজে তা আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তথাকথিত আধুনিকতার নামে নারীদেহকে করেছে বাজারের পণ্য। অনেক সময়ই নারীরা তা বুঝতে পারেন না। দীর্ঘকাল ধরে মধ্যযুগীয় মানসিকতার বোঝা বহন করে আজ বাইরের আবরণে আধুনিকতা এলেও, মননে-মানসিকতায় নারী কি যথার্থ আধুনিক ও স্বাধীন হয়ে উঠতে পেরেছে? বিজ্ঞাপনে নারীদেহের নগ্ন প্রচারের ব্যবসায় যেমন পুঁজিপতিরা মুনাফা লোটে, নানাভাবে গণিকাবৃত্তির পথে ঠেলে দিয়েও তারা মুনাফা লোটে। নারীদেহ যেখানে বাজারের পণ্য, সেখানে মা-বোন-মেয়ের সম্মান যে ধূলায় লুণ্ঠিত হতে বাধ্য — এই সত্যটাকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার জমকালো বুলির আড়ালে ঢেকে রাখতে চায়। সত্য হল, পুঁজিবাদী সমাজে পৃথিবীর কোথাও, সবচেয়ে 'উন্নত' দেশেও মেয়েরা প্রকৃত সমানাধিকারের মর্যাদা পায়নি। মেয়েদের জীবনের এই চরম অপমানকর মূল সত্যটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রচারের শোরগোলে চাপা দেওয়া হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নারীদের কী স্বাধীনতা ও মর্যাদা দেয় বা দিতে পারে, তা আমরা ভারতবর্ষে দেখছি। স্বাধীনতার ৬৪ বছর পরও যে দেশ কন্যাভ্রূণ হত্যায় ও নারী পাচারে বিশ্বে রেকর্ড করতে পারে, সে দেশে কতিপয় নারীর পেশাজগতে উচ্চপদ লাভ কিংবা শাসনে-প্রশাসনে গুটিকয়েক নারীর ভূমিকা পালনে কী এসে যায় দেশের কোটি কোটি নারীর? পুঁজিবাদী সমাজে নারীর এই চরম শোষিত-লাঞ্ছিত অবস্থানকে আড়াল করার জন্য যারা লোকসভা-বিধানসভায় নারীদের আসন সংরক্ষণ নিয়ে হৈ চৈ করে, তাদের চেয়ে বড় ভণ্ড আর কারা হতে পারে?

পুনর্বাসনের নামে বস্তিবাসীরা যেন প্রতারিত না হন

পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বে ভারত এখন 'সুপার পাওয়ার'। এর জোরেই আজ সে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের দাবিদার। এ হেন ভারতের প্রথম সারির শহরগুলিতে 'নোংরা বস্তির' উপস্থিতি তার 'সম্মানের' সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। কিন্তু কী করা যাবে? দেশের 'উন্নয়নে'র গতি যত বাড়ছে, সেই একই গতিতে বেড়ে চলেছে বস্তিবাসীর সংখ্যা। এই মুহূর্তে ভারতে বস্তিবাসীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯ কোটি ৩০.৬ লক্ষ।

দেশের সর্বত্র জমি থেকে, বস্তি থেকে উচ্ছেদ চলছে। উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনও চলছে রাজ্যে রাজ্যে। আন্দোলন চলছে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন এলাকায়, মহারাষ্ট্রে, দিল্লিতে, ওড়িশায় পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায়। এতেই ভয় পেয়েই কি সরকার কেন্দ্রীয় রাজীব আবাস যোজনার প্রস্তাব করেছে? অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ২ বছর আগে বাজেট বক্তৃতায় ৫ বছরের মধ্যে ভারতকে বস্তি মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই বস্তিমুক্তি বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ ছাড়া আর কীভাবে সম্ভব? কিন্তু সরকার খুব দয়ালু! তাই বিকল্প পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ভেবেছে সরকার বস্তিবাসীদের অত্যন্ত কম দামে ঘর দেওয়ার পরিকল্পনা করে। এজন্য তারা মন্ত্রীসভায় একটি প্রকল্প পাশ করে। ঘর দেওয়ার এই প্রকল্পের নাম রাজীব আবাস যোজনা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বক্তব্য, এই প্রকল্প কার্যকর হলে হয় কথায় নয় কথায় বস্তি উচ্ছেদ করতে হবে না। উচ্ছেদ হলেও বস্তিবাসীদের বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে বেঁচে থাকার। মানুষও নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করতে পারবে। এতে প্রত্যেক পরিবারের মাথা গোঁজার জন্য থাকবে ২৪ বর্গমিটারের একটি ফ্ল্যাট। প্রশ্ন হল, কাজের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো বেকার যুবক, সন্তানের মুখে অন্ন জোগানোর চেষ্টায় পরিচারিকার কাজ করা মা, পরিবার বাঁচিয়ে রাখার তাড়নায় এক কারখানায় কাজ হারিয়ে আর এক কারখানায় ছোটা শ্রমিকদের মতো অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীন মানুষগুলি কি এই বিকল্প ব্যবস্থায় আদৌ উপকৃত হবে? নাকি একচিলতে ছোট আশ্রয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন তাদের কাছে অধরাই থেকে যাবে?

বস্তিহীন দেশ গড়ে তুলতে কংগ্রেস সরকার যে আইন আনতে চলেছে, তার শুরুতেই বলা আছে অবস্থানের নিরিখে ঠিক হবে বাড়িগুলির মূল্য। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ শহর লাগোয়া বস্তির ক্ষেত্রে এর দাম হবে বেশি। বলা হয়েছে, বাড়িগুলি তৈরি করতে যা খরচ হবে, তার ১০-১৫ শতাংশ দামে বিক্রি করা হবে বস্তিবাসীদের কাছে। এমনকী তার জন্য ঋণও দেওয়া হবে সরকারের পক্ষ থেকে। তাতেও যা দাম পড়বে, দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগাড় করতেই যাদের দিন চলে যায়, তারা পারবে কি তা জোগাড় করে এই ফ্ল্যাটগুলি কিনতে?

শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত বস্তিগুলিতে যারা থাকে, তাদের কাজে যাওয়ার জন্য যানবাহনের ততটা প্রয়োজন হয় না, বিনা খরচেই তারা কাজে যায়, কিন্তু সরকারের পরিকল্পনা মতো ফ্ল্যাটগুলি শহরের কেন্দ্রে না হয়ে দূরবর্তী স্থানে হলে বস্তিবাসীদের জীবিকায় তা বড়সড় সমস্যার সৃষ্টি করবে।

সরকারের আরও বড় দ্বিচারিতা হল, তাদের প্রায় বিনামূল্যে ফ্ল্যাট দেওয়ার কথা ঘোষণা করা। কারণ, বস্তিবাসীদের ফ্ল্যাটগুলি বিলি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ নীতি অনুযায়ী বেসরকারি মালিকগোষ্ঠী, রাজ্য সরকার ও নাগরিকদের বিভিন্ন সংস্থাগুলিকে। বেসরকারি মালিকরা সরকারের থেকে কিছু ফ্ল্যাট বাজারদরে বিক্রি করার সম্মতিপত্র ইতিমধ্যেই আদায় করে নিয়েছে। যে প্রকল্প শুরু না হতেই বেসরকারি মালিকরা লাভের খেলায় নেমে পড়েছে, তাতে এই ফ্ল্যাটগুলি বস্তিবাসীরা যে শেষপর্যন্ত পাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা আছে কি?

সর্বোপরি, উপযুক্ত পুর্নবাসন না দিয়ে বস্তি উচ্ছেদ করা হবে না— কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণার যে কোনও সারবত্তা নেই, তা বোঝা যায় সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের বান্দ্রায় শিবালিক বিল্ডার্স কোম্পানির বহুমূল্য আবাসন প্রকল্পের জন্য বস্তি উচ্ছেদের পরিকল্পনায়। সেখানে সরকারি পরিকল্পনায় ২৬ হাজার মানুষ উচ্ছেদ হতে চলেছে। এলাকাবাসী, সমাজকর্মী মেধা পাটকর ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ এর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। উচ্ছেদকার্য সুসম্পন্ন করতে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহানের সরকার গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে নিরীহ মানুষকে। বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন দেওয়ার যে অঙ্গীকারপত্র সরকার এখানে দিয়েছে, তা ভুয়ো বলে সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলে সরকার প্রতারিত করেছে গরিব, অসহায় মানুষগুলিকে। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, ধানবাদ ও অন্যান্য শহরেও বস্তি উচ্ছেদ চলছে। কয়েক লক্ষ মানুষ উচ্ছেদের মুখে। চলছে প্রতিবাদ আন্দোলন। সেখানেও পুলিশি অত্যাচার তীব্র আকার নিয়েছে। পুলিশের গুলিতে ৮ জন আন্দোলনকারী মারা গেছে ইতিমধ্যেই। বস্তিবাসী দরদি কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার নিশ্চুপ। জমি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে যে উচ্ছেদ চলছে গোটা ঝাড়খণ্ড জুড়ে, তাকে কড়া হাতে বন্ধ করা দূরের কথা, কোনও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ করতে দেখা যাচ্ছে না কংগ্রেসকে। তাহলে কি এ কথা বলা যায় যে, কংগ্রেস বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনে সত্যিই আন্তরিক?

তাহলে কোন বিশ্বাসে বস্তিবাসীরা তাদের জমি ছেড়ে ফ্ল্যাট, শপিং মল, কারখানা করতে দেবে? পুনর্বাসনের বদলে লাঠি-গুলি জুটবে না তা কে বলতে পারে? এই অবস্থায় বস্তিবাসীরা রাজীব আবাস প্রকল্পের বিষয়ে সরকারের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন কি?

দুর্নীতির পক্ষে সাফাই

একের পাতার পর

তা করেননি। পরবর্তী সময়ে যখন সংবাদমাধ্যমে বিপুল টাকায় লাইসেন্স হাত বদলের সংবাদ প্রকাশ পেল, তখন দেরিতে হলেও সি বি আই টেলিকম মন্ত্রকে হানা দিয়ে তল্লাসি চালিয়েও বিস্ময়করভাবে 'অভিযোগ প্রমাণের মতো' কিছু পেল না। এভাবেই চলল কয়েক মাস। শেষপর্যন্ত ক্যাগ রিপোর্টে যখন প্রমাণাদি দিয়ে এই চুরির ঘটনা ছেপে প্রকাশ পেল, একমাত্র তারপরই সরকার বুঝল, ধামাচাপা দেওয়ার আর উপায় নেই। তখনও কিন্তু কংগ্রেস 'ক্যাগ'-এর বিরুদ্ধে 'সীমা লংঘনের' অভিযোগ তুলেছিল, যেটা আজ প্রধানমন্ত্রীর মুখেও শোনা গেল। দুর্নীতিবাজদের ধরে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে যারা দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা কি প্রধানমন্ত্রীর 'দায়িত্ব পালনের সাফল্য' প্রমাণ করে?

ক্যাগ-এর বিরুদ্ধে এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ আনার পর প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, দুর্নীতির নিয়ে এভাবে অভিযোগ তোলার দ্বারা দেশকে কার্যত একটি পুলিশ রাষ্ট্রে পরিণত করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর এই হুঁশিয়ারিকে হাস্যকর বলে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। কারণ, দেশের কোথাও না কোথাও প্রায় প্রতিদিন যখন পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিরীহ নাগরিকদের বিনা কারণে হয়রানি করে যায়, শুধু সন্দেহের বশে জেলে পুরে দেয়, থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চালায় এমনকী হত্যা পর্যন্ত করে, তখন তার পরিণতি নিয়ে সরকারি কোনও কর্তার মুখে কখনও কোনও আশঙ্কা ও উদ্বেগের ছিটেফোঁটা শোনা যায় না। কিন্তু যে মুহূর্তে টাটা ও আম্বানিদের টেলিফোনের কথা ট্যাপ করে শোনা হয় এবং ধরা পড়ে যায় যে, টেলিকম লাইসেন্স দুর্নীতিতে টাটা যুক্ত, কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় তৈল উত্তোলনের লাইসেন্স আম্বানিকে জলের দরে দেওয়া হয়েছে, কোনও বেসরকারি কোম্পানির কর্তাদের ঘুষ ও কাটমানির কারবার ধরা পড়ে যাওয়ায় তাদের গ্রেপ্তার হতে হয়, তখনই স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা যায় 'গেল গেল' রব। মুষ্টিমেয় পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এই কথোপথন দেশের কর্পোরেট পুঁজিপতিরা পড়ে অবশ্যই হাততালি দিয়েছে এবং পণ্ডিত প্রধানমন্ত্রী যে তাঁর শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ও দেশের প্রকৃত শাসকদের প্রতি বিশ্বস্ততায় অবিচল, তা জেনে আহ্লাদিত হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ যারা জনগণের সম্পত্তির এমন বেপরোয়া লুট বন্ধ করতে ও দোষীদের খুঁজে বের করে তাদের শাস্তি চায়, সরকার পরিচালনায় স্বচ্ছতা দাবি করে, তারা কিন্তু বুঝে নেবে যে, কংগ্রেসের এই সরকারটি আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত ও দেশি-বিদেশি একচেটে পুঁজিপতিদের সেবায় নিবেদিত। দুর্নীতির কোনও সুরাহা এই সরকারের কাছে আশা করা বাতুলতা যদি না গণআন্দোলনের চাপে তাকে বাধ্য করা যায়।

প্রেসিডেন্ট গদ্দাফি কেন আমেরিকার চক্ষুশূল

সাম্প্রতিককালে আরব ভূখণ্ড ও মধ্যপ্রাচ্যে গণআন্দোলনের ঝড় বইছে। দীর্ঘকালের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে জনতা। টিউনিশিয়া থেকে সূত্রপাত। তারপর মিশর হয়ে লিবিয়া এবং বাহারিন — হাজারে হাজারে মানুষ রাজপথে নেমেছে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও সুশাসনের দাবিতে। শাসকশ্রেণী সর্বত্র প্রথমে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী এবং অবশেষে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের শেষ রক্ষক সেনাবাহিনীকে দিয়ে গণবিক্ষোভ দমন করার চেষ্টা করেছে। টিউনিশিয়ার সফল আন্দোলন প্রেরণা জুগিয়েছে মিশরের জনতাকে। মিশরের আন্দোলন প্রভাবিত করেছে লিবিয়া ও বাহারিনকে। এদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশ ফ্রান্স, ব্রিটেন, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে। এক্ষেত্রে এক অদ্ভুত দ্বিচারিতা লক্ষ করা যাচ্ছে, বিশেষত লিবিয়া ও বাহারিনের ক্ষেত্রে।

বাহারিনের স্বৈরাচারী রাজপরিবার আল খলিফাকে বাঁচাতে ১৪ মার্চ মার্কিন মদতপুষ্ট সৌদি আরবের সেনাবাহিনীর ২০০০ সৈন্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজধানীতে অনুপ্রবেশ করে। পরদিন সৌদি সেনার হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে দশ হাজার মানুষ বাহারিনের সৌদি দূতাবাস ঘেরাও করলে সৌদি সেনারা নির্বিচারে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যা করে। বাহারিনের শাসকরাও জরুরি অবস্থা জারি করে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের সমস্ত সুযোগ কেড়ে নিয়ে সামরিক আইন ও কার্ফু জারি করেছে। এসবই ঘটেছে মার্কিন শাসকদের পরোক্ষ সমর্থনে। কারণ, বাহারিন একসময় ছিল ব্রিটিশ কলোনি এবং তার রয়েল নেভির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, বর্তমানে যা ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম নৌবহর। এটাই তেল সমৃদ্ধ খাঁড়ি অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের তাঁবেদার বাহারিনের শাসকদের রক্ষা করতে বিক্ষোভকারীদের দমন করার জন্য সৌদি বাহিনীর অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে নীরব। একইভাবে টিউনিশিয়া ও মিশরের স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে যখন সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার হোসনি মুবারকের মতো শাসকরা নির্মমভাবে দমন করেছে, তখন মার্কিন সহ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা বিশ্বজনমতের চাপে মৌখিক প্রতিবাদ ও আন্দোলনকারীদের প্রতি লোক দেখানো সহানুভূতি জানিয়েছে। অপরদিকে কালক্ষেপ করে উক্ত দেশগুলোর ঘৃণিত তাঁবেদার শাসকদের পরিবর্তে তাদেরই অনুগত অন্য কোনও শাসককে ক্ষমতাসীন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই জনগণের উপর দমনপীড়নের প্রতিবাদে রাষ্ট্রসংঘ ও ন্যাটোর সামরিক হস্তক্ষেপের প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু লিবিয়ার প্রশ্নে দেখা যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের অন্য রূপ। লক্ষ করার বিষয়, এখানে বিরোধীদের আন্দোলন টিউনিশিয়া, মিশর বা বাহারিনের মতো নিরস্ত্র জনতার গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হয়নি। প্রথম থেকেই তা ছিল সশস্ত্র। বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেছে, এই সশস্ত্র বিদ্রোহীদের প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন ও মদত জুগিয়ে যাচ্ছে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। প্রশ্ন উঠেছে, বাহারিনের একনায়ক রাজ পরিবারের প্রতি যারা সহানুভূতিশীল তারাই লিবিয়ার একনায়ক শাসক গদ্দাফির উপর হঠাৎ এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে কেন? সমস্ত আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করে রাষ্ট্রসংঘ সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় লিবিয়ার উপর নিষিদ্ধ উড়ান অঞ্চল ঘোষণা করেছে শুধু নয়, ১৯ মার্চ থেকে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোমাবর্ষণ ও সামরিক আক্রমণ চালিয়ে তার সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে।

উপরোক্ত দেশগুলি তথা আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশেই দীর্ঘদিন ধরে স্বৈরাচারী একনায়কত্ব চলছে, চলছে নাগরিকদের উপর প্রায় মধ্যযুগীয় শাসন ও শোষণ। তার জ্বলন্ত উদাহরণ সৌদি আরব। সেক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীরা অদ্ভুত রকম উদাসীন। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, ইরাকের বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রতিককালে লিবিয়ার বিরুদ্ধে তারা এত তৎপর কেন?

এর জবাব পেতে গেলে আমাদের একটু পিছনের দিকে এবং সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার দিকে নজর দিতে হবে। ১৯৬৯ সালে এক জাতীয়তাবাদী সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মুয়াম্মার গদ্দাফি লিবিয়ার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতাসীন হয়েই গদ্দাফি লিবিয়ার তৈলখনিগুলিকে জাতীয়করণ করে তার উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে জনসাধারণের মানোন্নয়নের জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা একদিকে দেশের মানুষের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে, অপরপক্ষে তাঁকে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্ষুশূল করে তুলেছে। পরবর্তীকালে একটি বিশাল বিস্ফোরণের মতো নাশকতার ঘটনাকে অজুহাত করে গদ্দাফির বাসভবনের ওপর আমেরিকা বোমাবর্ষণ করে হামলা চালায়। এভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপের কাছে কিছুটা নতিস্বীকার করে বিশেষত মার্কিন রাষ্ট্রপতি সিনিয়র বুশের আমলে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরাক আক্রমণের পরে গদ্দাফি তাঁর দেশের তৈলক্ষেত্রগুলিকে বিদেশি পুঁজির কাছে আংশিকভাবে উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য হন। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা লিবিয়ার সস্তা তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও জনসম্পদ লুঠ করার সুযোগ পেয়ে যায়।

সম্প্রতি 'উইকিলিকস'-এর ফাঁস করা তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ২০০৯ সালের ৪ জুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেম ক্রেজ তাঁদের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়েছেন, সম্প্রতি লিবিয়া বিদেশি তেল সংস্থাগুলোকে বিশেষত, ফরাসি তেল সংস্থাকে বাধ্য করেছে কম পরিমাণ তেল ও গ্যাস উত্তোলন করতে। এগুলোকে পুনরায় জাতীয়করণ করার পথেই তারা এগোচ্ছে।

সুতরাং এই মূল্যবান খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর লিবিয়া সরকারের পুনরায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক তেল কোম্পানি ও রাষ্ট্রগুলোকে ক্ষিপ্ত করে তুলবে এতে আর সন্দেহ কী? স্বাভাবিকভাবেই ক্ষিপ্ত ফরাসি সরকার যে লিবিয়ার বেনগাজিতে বিদ্রোহীদের স্বীকৃতি ও মদত দেবে এতে আর আশ্চর্য কী? উল্লেখ্য, লিবিয়ার ৮০ শতাংশ তেল উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এই বেনগাজিতে বিদ্রোহী সেনাদের সরকারি বাহিনী কার্যত অবরুদ্ধ করে ফেলেছে।

ফলে তেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের ওপর তাদের কর্তৃত্ব খর্ব হয়ে যাবে বলে ক্ষিপ্ত আমেরিকা, ফ্রান্স সহ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। যদিও বিশ্ববাসীর কাছে তারা প্রচার করছে, লিবিয়ার মানুষকে বাঁচানোর জন্যই তারা নাকি সেনা হামলা শুরু করেছে। এর থেকে ছেলেভোলানো কথা আর কী হতে পারে! ইরাকের ক্ষেত্রেও তারা মানুষকে গণতন্ত্র দেওয়ার কথা বলেছিল, বাস্তবে তারা সেখানে গণতন্ত্রের কবরই খুঁড়েছে।

তাই গদ্দাফির একনায়কতান্ত্রিক অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভকে সশস্ত্র মদত জুগিয়ে গদ্দাফির পতন ঘটিয়ে নিজেদের অনুগত শাসককে তারা লিবিয়ায় বসাতে চাইছে, যা আরব দুনিয়া সহ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণ মেনে নেবে না।

(তথ্যসূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, ইউ এস এ, ১৭-৩-২০১১)

বাংলাদেশে '৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে বাসদ-এর সংসদ অভিযান

হাইকোর্টের রায়ের পরও 'বিসমিল্লাহ', 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম', 'ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল করার বিধান' রেখে সংবিধান সংশোধনের অপতৎপরতার প্রতিবাদে এবং অসম্পূর্ণতা দূর করে দ্বিতীয় সংশোধনী পূর্ব '৭২-এর মূল সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে ৩০ জুন সংসদ অভিযান করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গৃহীত

মূল সংবিধানে চারটি মূলনীতি যথা সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া শাসক দল বারবার সংবিধান সংশোধন করে এই মূলনীতিগুলির প্রাণসত্তা হরণ করেছে। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান ঐদিন প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে বলেন, ১৯৮৮ সালে স্বৈরাচারী এরসাদ তাঁর অবৈধ শাসন বৈধ করার জন্য রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বিল পাশ করেছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেইসময় এই বিল পাশের সহায়তাকারীদের 'জাতীয় শত্রু' হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। খালেদা জিয়া বলেছিলেন, এর মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী সরকার বিভেদ সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এখন হাইকোর্ট সংবিধানের ৫ম ও ৭ম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করেছে। তৎসত্ত্বেও সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' এবং 'ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল করার বিধান' বহাল রেখেই হাসিনা সরকার সংবিধান সংশোধনের বিল সংসদে উত্থাপন করেছেন। এই দ্বিচারিতার কারণ দেখাতে গিয়ে কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, যত দিন যাবে ততই বুর্জোয়া শক্তিসমূহের কৌশলগত পার্থক্য রেখাও মুছে যেতে থাকবে। কারণ, তাদের শ্রেণী উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন, যতই তাদের বাস্তবায়ন কর্মসূচি ও ঐতিহ্যগত পার্থক্য এবং বাচনিক ভিন্নতা থাকুক।

সংসদ অভিযানের অন্যান্য দাবিগুলি ছিল অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজ এই ৬টি মৌলিক অধিকারকে সংবিধানের তৃতীয় ভাগে যুক্ত করা, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী পুরুষ সমানাধিকার নিশ্চিত করা, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ ও জরুরি আইন বিধান বাতিল করা ইত্যাদি।

বিক্ষোভ সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, বজলুর রশীদ ফিরোজ ও রাজেকুজ্জামান রতন। প্রেস ক্লাব থেকে মিছিল হাইকোর্ট, মৎস্য ভবন হয়ে শাহবাগের দিকে এগোতে থাকলে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে। পরে মিছিলটি সোহরাওয়ারদি উদ্যানের ভিতর দিয়ে জাদুঘরের সামনে শেষ হয়। বাসদ নেতৃবৃন্দ উক্ত দাবিগুলি পূরণ করা সহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে বাধ্য করতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সকল বামপন্থী শক্তিগুলির কাছে আহ্বান জানান।

পেনশন ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষক ও কর্মচারীর ধর্মঘট ব্রিটেনে

পেনশন নিয়ে ৩০ জুন শিক্ষক ও কর্মচারীদের এক বিশাল ধর্মঘট হয়ে গেল ব্রিটেনে। সংবাদমাধ্যমগুলি বলেছে, গত শতকের আটের দশকের পর এত ব্যাপক ধর্মঘট আর হয়নি। শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নগুলির ডাকা এই ধর্মঘটে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিটেনের সরকার চেষ্টা করছে ২০২০ সালের মধ্যে অবসরের বয়স ৬০ থেকে ৬৬তে উন্নীত করার। কর্মচারীরা তা মানতে নারাজ। শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন থেকে পেনশন তহবিলে দেয় অর্থের পরিমাণ কয়েকবার বাড়ানোর পরেও বেতন থেকে আরও টাকা কেটে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে সরকার। পেনশন ছাঁটাইয়ের কথাও তারা বলেছে। প্রতিরোধে ছাত্র সহ আন্দোলনে নেমেছে সর্বস্তরের মানুষ। আন্দোলনের এক নেতা বলেছেন, 'দিনে দুপুরে ডাকাতি' করছে ব্রিটেন সরকার।

ব্রিটিশ সরকার এবারের বাজেটে সামাজিক খাতে বরাদ্দ ব্যাপকভাবে ছাঁটাই করেছে। মন্দাক্রান্ত পুঁজিপতিদের আর্থিক অনুদান ও কর ছাড় দিয়ে অর্থসংকটে ভোগা এই সরকারের পক্ষে পেনশন দেওয়া এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণেই সরকার চাইছে চাকরির বয়সসীমা বাড়িয়ে দিতে। দ্বিতীয়ত, পেনশন ফান্ডে সরকারের দেয় বন্ধ করে দিয়ে সেটা পুরোপুরি কর্মচারীদের বেতন নির্ভর করে তোলা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষক ও কর্মচারী এই ধর্মঘটে যোগ দেন। এই ধর্মঘটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী। শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা ধর্মঘটের দিনই এক বিবৃতিতে বলেছেন, কর্মচারী ও শিক্ষকরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের সমস্যা মেটানোর জন্য সরকারকে বারবার বলেছিলেন। কিন্তু সরকার তা না শোনায় তাঁরা অনন্যোপায় হয়ে এই ধর্মঘটে যোগ দেন। তিনি আরও বলেন, বিশ্বায়নের এই সময়ে ইউরোপের প্রতিটি দেশে পেনশন ছাঁটাই একটা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

ধর্মঘটের দিন লীড শহরে এক মিছিলে উপস্থিত একটি শিশুর প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল —"আমি যখন বড় হব শিক্ষক হওয়ার চেষ্টা করব না।"এই বক্তব্যের মধ্যেই ফুটে উঠেছে ব্রিটেনের শিক্ষকদের জীবন-জীবিকার দুরবস্থার কথা। বাস্তবে আজ সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীর জীবনই পুঁজিবাদী শাসনে বিপর্যস্ত। এর আগেও অনেক বড় বড় ধর্মঘট হয়েছে ব্রিটেন সহ ইউরোপের নানা দেশে। কিন্তু 'লেবার অ্যারিস্টোক্র্যাট' নেতৃত্বের আপসকামিতার জন্য আন্দোলন বারবার বিপথগামী হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনকে তার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে যথার্থ বিপ্লবী নেতৃত্ব অপরিহার্য — অতীতের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই তুলে ধরছে।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

পঠন-পাঠন আর সোচ্চার আন্দোলন এটাই প্রেসিডেন্সির ঐতিহ্য

বহু ছাত্রছাত্রীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে দু'পায়ে মাড়িয়ে সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ভর্তি ফি সহ সমস্ত রকম ফি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ফর্মের দাম বাড়িয়ে ৫০ টাকা করা হয়েছে। মাসিক টিউশন ফি বাড়ছে। বাড়ছে ভর্তির ফি, ল্যাবরেটরি-লাইব্রেরি সহ অন্যান্য ফি, চালু হবে কশান মানি। ডেভেলপমেন্ট ফি ধার্য করা হয়েছে ২৫০০ টাকা। সব মিলিয়ে কলা বিভাগে একজন ছাত্রকে দিতে হবে বছরে ৬০০০ টাকা, বিজ্ঞান বিভাগে দিতে হবে ৭৫০০ টাকা। অর্থাৎ ক্লোজার-লকআউট, বেকারি আর মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত দরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বন্ধ হচ্ছে প্রেসিডেন্সির দরজা।

এই অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ডি এস ও আন্দোলনে নামে। আইসি-ও প্রতিবাদ করে। আন্দোলনের চাপে ডেভেলপমেন্ট ফি পুরোপুরি প্রত্যাহৃত হয়। সব মিলিয়ে আন্দোলনের চাপে কলা বিভাগে কমল ৩০০০ টাকা, বিজ্ঞানে ৩৫০০ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার সময় রাজ্যের তৎকালীন শাসকদল, প্রেসিডেন্সি কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম প্রেসিডেন্সিকে বিশ্বমানে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্নের ছবি দেখিয়েছিল বার বার। আর এর মধ্যে দিয়ে ফি বৃদ্ধি ও বেসরকারিকরণের পক্ষে জনমতকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেয়ে এসএফআই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বিজয়োৎসব করেছে। এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, রেজাল্ট কেলেঙ্কারি, তলানিতে ঠেকা শিক্ষার মান ইত্যাদিতে তিতিবিরক্ত এবং পরিকল্পিত প্রচারে বিভ্রান্ত কলেজের ছাত্রদের এক বৃহৎ অংশ এবং শিক্ষক অভিভাবক অনেকে ভেবেছিলেন এতে প্রেসিডেন্সির গৌরব ফিরে আসবে। তাই প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার পর 'অবশেষে মুক্তি'র আস্বাদে অকাল হোলিতে মেতেছিলেন তাঁদের অনেকেই। কিন্তু এতে সামিল হতে পারেনি ডিএসও। প্রেসিডেন্সিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার নামে কৌশলে বাণিজ্যিকীকরণের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিল তারা। ডিএসও অবশ্যই চেয়েছিল প্রেসিডেন্সির মুক্তি, তবে তা যথার্থই উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। কিন্তু যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বিলের অনুসরণে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি বিল রাজ্য বিধানসভায় পেশ হয়েছিল, তা আসলে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত ন্যাশনাল নলেজ কমিশন এবং যশপাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রচিত, যার ছত্রে ছত্রে বাকচাতুর্যের আড়ালে রয়েছে শিক্ষা বিক্রির সচেতন পরিকল্পনা। যেখানে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি নেহাত অজুহাত, অর্থোপার্জনই আসল উদ্দেশ্য। ছাত্রদের নানা গণতান্ত্রিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করার ইঙ্গিত ছিল এই বিলে। তাই ডিএসও-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, যথার্থ উৎকর্ষতার কেন্দ্র হিসাবে প্রেসিডেন্সিকে গড়ে তুলতে হলে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিলটির সকল দিক নিয়ে দেশের সর্বস্তরে শিক্ষাবিদ ও ছাত্র সংগঠনগুলির সাথে আরও গভীর মত বিনিময় হোক। কিন্তু তা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় করার বর্ষপূর্তি হয়নি এখনও। অকাল দোলের লাল-নীল রঙ এখনও খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে কমনরুম-করিডরের আশেপাশে। এরই মধ্যে ফি বৃদ্ধির ঘোষণা! শুধু কি তাই? বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হওয়ার পরই পূর্বতন কলেজের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদের বঞ্চিত করা হল গণতান্ত্রিক উপায়ে ছাত্রসংসদ গঠনের অধিকার থেকে। এ বছর ছাত্র ভর্তির আগে জানিয়ে দেওয়া হল সংগঠনের উদ্যোগে কোনও হেল্প-ডেস্ক করা যাবে না, যাবে না ব্যানার লাগানো। এতে নাকি জনমনে বিরূপ প্রভাব পড়বে। গণতন্ত্রের নয়া এই মন্ত্র তো লিংডো কমিশনের সুপারিশ! এই সব ঘটনা প্রবাহ আমাদের অভিমতকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে, কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত আসলে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি, '৮৬-এর ধারাবাহিকতায় শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে সংকুচিত করা এবং এর বিরুদ্ধে যেকোনও প্রতিবাদ দমনের পরিকল্পনার নীরব বাস্তবায়ন। ওড়িশার র‍্যাভেনশ কলেজ সহ যেখানেই এই বিল কার্যকর হয়েছে, সেখানে এই পথেই প্রাইভেট-পাবলিক-পার্টনারশিপ মডেল তৈরি করে শিক্ষার বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত করে শিক্ষাকে মহার্ঘ্য পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্সিতেও পি-পি-পি মডেল অনুসরণের চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

তাই ছাত্রদের সাথে আলোচনা করে নয়, শিক্ষার বেসরকারিকরণের কট্টর সমর্থক কিছু খ্যাতনামা ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত তথাকথিত মেন্টর গ্রুপকে সামনে রেখে কিছু সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। যাতে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছাত্ররা থমকে যায়। কিন্তু প্রেসিডেন্সির ইতিহাস অন্যরকম। এই প্রতিষ্ঠান বারবার মুখরিত হয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে। নেতাজির দেখানো পথে এই তো সেদিনও পথে নেমেছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে। পঠন-পাঠন আর সোচ্চার আন্দোলন — এই হল প্রেসিডেন্সির ঐতিহ্য। প্রেসিডেন্সির সেই ঐতিহ্যময় পথ আজ ক্রমশ অবরুদ্ধ করা হচ্ছে। অর্থের কাছে বিক্রি হতে চলেছে সকলের প্রিয় এই শিক্ষাঙ্গন। এর প্রতিবাদে চাই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। ইতিমধ্যেই ডিএসও একাধিকবার ডেপুটেশন, প্রচার-বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। আন্দোলনের চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছেন এবং ডেভেলপমেন্ট ফি কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ডিএসও-র দাবি বর্ধিত সমস্ত ফি প্রত্যাহার। এই দাবিতে আন্দোলন চলবে।

কমসোমলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শিবির

১২-১৪ জুন বসিরহাট হাই স্কুলে কমসোমলের জেলা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও কমসোমলের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শিবিরের কাজ শুরু হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০০ জন কমসোমল সদস্য শিবিরে অংশগ্রহণ করে। সদস্যদের প্যারেড, পিটি, ড্রিল, খেলাধূলা করানো হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কমসোমল সদস্যরা উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে। দলের জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নেতা প্রয়াত কমরেড দেবপ্রসাদ ভঞ্জ চৌধুরীর স্মৃতিতে শিবিরের সকল সদস্যদের হাতে একটি করে পেন ও ফাইল তুলে দেওয়া হয়। বসিরহাট হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুধীর সরকার কিশোর-কিশোরীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার আহ্বান জানান।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গণদাবী-র সডাক গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে গ্রাহক চাঁদা পাঠিয়ে পত্রিকা প্রকাশনে সাহায্য করুন।

বার্ষিক চাঁদা ঃ ১১৭ টাকা (সডাক)
যাণ্মাসিক চাঁদা ঃ ৫৯ টাকা (সডাক)

প্রেসিডেন্সিতে ফি বৃদ্ধির সার্কুলার পোড়াল ডি এস ও

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে আন্দোলনের পাশাপাশি এ আই ডিএসও-র কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২৯ জুন এক ছাত্র মিছিল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যায় এবং বিক্ষোভ দেখায়। সেখানে বর্ধিত বেতন কাঠামোর সার্কুলার পোড়ানো হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড রাজকুমার বসাক। জেলা সম্পাদক কমরেড ইমতিয়াজ আলম বলেন, পূর্বতন সিপিএম সরকারের মতোই বর্তমান সরকারও ফি বাড়িয়ে ডোনেশন প্রথা চালু করে শিক্ষার সার্বিক বেসরকারিকরণের পথে হাঁটছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমরা আশা করি নতুন সরকার এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্ধিত ফি যতক্ষণ না সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করবে, আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

ঝাড়খণ্ডে মালিকানা হক দিবস পালিত

ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ 'হুল'-এর ১৫৬তম বার্ষিকীতে ৩০ জুন বস্তি বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি রাঁচিতে 'মালিকানা হক দিবস' পালন করে। এই উপলক্ষে দখলদারি বন্ধ করার অজুহাতে বস্তি উচ্ছেদের সরকারি অপচেষ্টার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তার পূর্বে সেখানে সরকারের প্রতীকী কুশপুতুল জ্বালানো হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিনয় কুমার, বক্তব্য রাখেন সংঘর্ষ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধেশ্বর সিং।

তাঁরা বলেন, আদিবাসী মানুষের উপর ব্রিটিশ সরকার এবং দেশীয় মহাজনদের অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সিধু-কানহুরা বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়েছিলেন। সেই সংগ্রামে বহু আদিবাসী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। আজ আমাদেরও শপথ নিতে হবে যে, আমরা আমাদের জমি ছাড়ব না, তাতে প্রাণ দিতে হলেও আমরা পিছপা নই। এইচ ই সি এলাকায় উচ্ছেদ শুরু হলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতিজনিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে। তাঁরা দাবি করেন, পাহাড়িটোলা ও রুগরিগরহার মানুষদের ঐ স্থানেই অবিলম্বে পুনর্বাসন দিতে হবে। তাঁরা খোলা আকাশের নিচে এক অবর্ণনীয় অবস্থায় রয়েছেন।

পানীয় জলের দাবিতে পানাগড়-মোরগ্রাম হাইরোড অবরোধ

নলহাটি পৌরসভার ২৮ লক্ষ টাকা মূল্যের জল সরবরাহের পাইপ চুরি হয়। আজও সেই বিরাট দুর্নীতির কোনও কিনারা হয়নি। নলহাটি পুরবাসী পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই মারাত্মক সমস্যা সহ নিকটবর্তী জাতীয় সড়কে দাঁড়ানো ট্রাকগুলির অপসারণ, পথ দুর্ঘটনা সহ রাস্তার ক্ষতি বন্ধ করা, ডিজেল-কেরোসিন-রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি রোধ প্রভৃতি দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নলহাটি লোকাল কমিটির উদ্যোগে ২৩ জুন পানাগড়-মোরগ্রাম হাইরোড অবরোধ হয়। নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) আঞ্চলিক নেতা কমরেড আব্দুস সালাম। অবরোধে বহু মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। দাবিগুলি নিয়ে নলহাটি থানা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

জয়নগরের সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের বর্ধিত বেতনের অর্থে গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের বিজ্ঞপ্তি

নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত গরিব অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তির জন্য নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী অনুযায়ী আবেদন করতে পারবেন ঃ

(১) জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৯টি ব্লকের প্রতিটি ব্লক থেকে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর একজন করে গরিব অথচ মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীকে একটি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করা হবে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সাধারণ জ্ঞান ও পূর্ববর্তী শ্রেণীর সিলেবাস অনুযায়ী হবে। প্রয়োজনে পূর্ববর্তী পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে ও পারিবারিক আয়ের নিরিখে পরীক্ষার্থীর প্রাথমিক নির্বাচন করা হবে। (২) নবম ও একাদশ শ্রেণীর নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রীরা দুই বছরের জন্য এবং এ বছর দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীরা এক বছরের জন্য বৃত্তি পাবে। নবম ও দশম শ্রেণীর বৃত্তির পরিমাণ প্রতিমাসে ৭০০ (সাত শত) টাকা এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বৃত্তির পরিমাণ প্রতি মাসে ১০০০ (এক হাজার টাকা)। (৩) জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত স্কুলে পাঠরত/পাঠরতা এবং এই লোকসভা কেন্দ্রে বসবাসকারী ইচ্ছুক গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার শংসাপত্র, অঞ্চল প্রধান বা সরকারি আধিকারিকের দেওয়া বসবাস ও আয়ের শংসাপত্র ও পূর্ববর্তী পরীক্ষার মার্কশীট সহ সাদা কাগজে হাতে লিখে বা টাইপ করে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫-৭-১১। (৪) আবেদন পত্র পাঠানোর ও যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ডঃ মৃদুল দাস, এস ইউ সি আই (সি) অফিস, জয়নগর-মজিলপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা অথবা এস ইউ সি আই (সি) অফিস, ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ফোন ঃ ৯৪৭৭০১৮৫২৭

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।